যোগিরাজ

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের

জীবন স্মৃতি

ও

পত্রাবলী
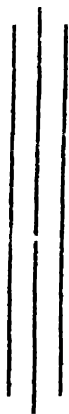
আনন্দ মোহন লাহিড়ী

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রী আদ্যনাথ ট্রাষ্ট।
২৬/এ, কবি কিরণধন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী — ৭১২২৫৮

প্রকাশ
চম্পক চতুর্দ্দশী
৩২ জৈষ্ঠ, ১৪০৭
ইং ১৫ ৬.২০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রী আদ্যনাথ ট্রাষ্ট
২৬/এ, কবি কিরণধন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী - ৭১২২৫৮

মুদ্রাকর ঃ
অভিনব মুদ্রনী
৭৭/১, সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০০৬

অক্ষর বিন্যাস ঃ
জে. এম লেজার গ্রাফিক্স
ভদ্রকালী - ৭১২২৩২

প্রকাশের নিবেদন

পরম পূজনীয় গুরুদেবের কৃপায় ও তাঁর আশীর্ব্বাদে ক্রিয়ান্বিতবর্গের অনুরোধ ও কল্যাণে এবং ধর্ম পিপাসু ব্যক্তিগণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণার্থে এই অমূল্যগ্রন্থ "পত্রাবলীর" সাথে "জীবনস্মৃতি" সংযোজিত হয়ে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হল।

-শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

ঐ যে সম্মুখে উজ্জ্বল সৌম্য সদানন্দ শান্ত অবিচলিত মূর্ত্তি দেখিতেছ উনি কে? উনি সামান্য মনুষ্য নহেন। ইঁহাকে আমরা যেগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী বলিয়া জানি। গৃহী আপনাকে অপদার্থ মনে করিয়া নিজকে কত ধিক্কারই না করে কিন্তু ইনি যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীর আদর্শ হইয়া গৃহীর পক্ষে কি সম্ভব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধ গুরুদেব বহু তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীদিগকে তাহাদিগের চেয়েও যে তাঁহার উচ্চাবস্থা তাহা পরীক্ষা করিতে ও তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ঐ যোগিরাজ কাহার ধ্যানে মগ্ন? ঐ যে ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু, উহা মুদ্রিত নহে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি কোন এক অজানা শক্তির পাছে পাছে ছুটিতেছে, কেহই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। করুণার সাগর ঐ বিশাল হৃদয় বিশ্বজগৎকে উপেক্ষা করে নাই। ঐ যে যোগিরাজ উনি কেন এত সুপ্রসন্ন? কাহার প্রতি এ প্রসন্নতা? ঐ অপূর্ব্ব উন্নত মনোহর স্কন্ধ লক্ষ্য কর, কন্ঠকূপের উপর দৃঢ়ভাবে চিবুক স্থাপিত করিয়া অত্যন্ত প্রবীণ হইয়াও নবীন কিশোরের ন্যায় উনি কি প্রচার করিতেছেন জান?

বর্ত্তমান যুগের শিশু! বর্ত্তমান যুগের যুবক! তোমরা জাননা কত বড় বিপদ মাথায় নিয়ে তোমরা জন্ম নিয়েছ, কিন্তু ঐ মূর্ত্তি তোমাদের সকল বিপদের কথা জানেন, কত শত যুগের অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যা শাসন ভ্রুকুটী করিয়া আজ মনুষ্য জাতির মাথার উপর আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু মানুষ ভাবে না, তাকাইয়া দেখেনা কত শত বিপদ তাহাকে ঘেরিয়া কোথায় ধ্বংস করিয়া দিতে পারে! ঐ মূর্ত্তি সর্ব্ববিপদহন্তা, আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্ তাই এত দৃঢ়, এত সুপ্রসন্ন! আজ তাঁহাকে চিনিতে বুঝিতে ধৈর্য্য চাই। সামান্য অগ্নি যেমন পর্ব্বত প্রমাণ তুলারাশিকে নিমেষে ভস্ম করে, উনিও যেমনি জীবের অনন্ত

দুঃখরাশি মুহূর্ত্তেই নষ্ট করিতে পারেন। ইঁনি কে তোমরা জান কি? ইঁহাকে হয়ত চিনিতে পারিলে না। চিনিবে যদি আর একটা জিনিষ জান। এই সেদিন সবেমাত্র যাহারা পৃথিবীতে জন্ম নিলে, হে বর্ত্তমান যুগের নবীন শিশু! তোমরা জান কি কত তাড়কা রাক্ষসী তোমাদের ঘেরিয়া আছে? স্তন্য দানের ছলে বিষপান করাইবার জন্য কত কে আছে? তোমাদের সম্মুখে ধর্ম্মের নামে কত অত্যাচার, অবিচার, মিথ্যাশাসন মোহন মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের বিভীষিকা হয়ত তোমরা সারা জীবনেও টের পাইবে না। কিন্তু ঐ অন্তর্যামী মহাপুরুষের তীব্র কটাক্ষে সমস্ত বৃথা শাসন কোথায় কি হইয়া গিয়াছে দেখ দেখি, তাহা হইলে ইঁহাকে চিনিবে।

বর্ত্তমানযুগের প্রচন্ড মার্ত্তন্ড আবার চন্দ্র হতেও শীতল, ঐ যে বিপদহন্তা দয়াময় শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ উঁহার পরিচয় গ্রহণ কর। আজ তিনি সকলের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত। এ নহে কবিতা, এ নহে ছলনা, সত্যই তিনি আজ প্রাণ নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত। সত্যই তিনি বলিতেছেন ভাত চাও, কি চাও বল, সত্যই তোমার কোন অভাব থাকিবে না। যদি কেহ তাহার বিপদকে না চিনে, অপূর্ব্ব শক্তি-বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ঐ যে দুটী চক্ষু দেখিতেছ উহারা তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে। তিনি বর্ত্তমান যুগে সত্যের অগ্রদূত, এ যুগে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি রাজনীতিক, কি ধর্ম্মপ্রচারক, কি বিপ্লববাদী, কি যুগাবতার, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান সকলেই ইঁহার বাণী শুনিতেছে, সকলেই ইঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, ইহার কারণ কি? ঐ মূর্ত্তিতে দৃঢ়তাব্যঞ্জক সত্য প্রতিষ্ঠার যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যদি বুঝিতে চাও তবে এস তিনি তোমারই দ্বারে। তাঁহার পরিচয় দিই।

যখন পন্ডিতেরা গবেষণার পর গবেষণা করিয়াও এক একটা

ব্যাপার স্থির করিতে পারিত না, তখন বিদ্রূপ করিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও একেবারে তাহাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন না। কেহ একটা মীমাংসার বিষয় লইয়া যাইলে তিনি অর্ন্তদৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইতেন যে অনেক সমস্যাই সে মনে মনে মীমাংসিত হইয়াছে মনে করে রেখেছে বটে কিন্তু মীমাংসা তাহার হয় নাই। যে সকল আপাততঃ সিদ্ধান্তকে মীমাংসা বলিয়া সে জগৎকে বুঝিয়ে এসেছে, তিনি ঠিক সেইগুলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। বলিতেন, "আমি আপনাকে কি শিক্ষা দিব তবে যখন এসেছেন তখন দয়া করে আমার কয়েকটা সন্দেহ মিটাইয়া দিন।" এই কথার পর নিতান্ত শিশুর ন্যায় তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া কোন কোন বিদ্যাভিমানীকে অস্থির করিয়া তুলিতেন, পন্ডিতরা যখন নিজেদের মীমাংসা ও শাস্ত্রের বর্ণনা না মিলাইতে পারিয়া "তাইত একি হল, একি হল" বলিয়া সমস্ত আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিত, যখন একেবারে হাবুডুবু খাইত, কেবল তখনই ঐ দয়াপারাবার দয়া করিতেন। তখনই তিনি বলিতেন, "আচ্ছা আপনাদের ত হল এইবার আমি কিছু বলি" — এই বলিয়া তিনি সাধনার দুই চারিটী সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া দিতেন ফলে সমস্ত মীমাংসাই হইয়া যাইত। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। তিনি জোর করে বলে গেছেন "এমন কলম মানুষের হাতে দিয়ে গেলাম যে তাহারা বিবেক বলে শাস্ত্র সংশোধন করে দিতে পারবে, এমন শক্তি দিয়ে দিলাম যে শাস্ত্র তাহাদের কুলকুচা হইবে। নিরক্ষর মালী, পানঅলা, চাষা, টানাপাখাঅলা, মহামহোপাধ্যায়, ডাক্তার, কবিরাজ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যে কোন জাতির লোক, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী, যেই তাঁহার নিকট সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে সেই ধর্ম্ম জগতের চাবি হাতে পাইয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া মিশিতে পারিয়াছে। গর্ব্বিত মহামহোপাধ্যায় হইতে সামান্য নিরক্ষর পানঅলা পর্য্যন্ত কোন শিক্ষাবলে মধুর মিলনে সর্ব্বদা মিলিত হইতে পারিত? দুচার দিনের শিক্ষা মানুষকে এত উন্নত করে দেয়, মানুষকে জ্ঞানের প্রদীপ দিয়ে দেয় একথা কি বিশ্বাস

হয়! বিশ্বজগৎ আজ কাহার শিষ্য ? সারা মানব জাতি আজ বিদ্রোহবাদের নিকট অবনত মস্তক। জগৎ আজ চায় ভালই হউক আর মন্দই হউক একটা বিদ্রোহই উপস্থিত করিতেই হইবে, সব জিনিষ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। এই বিদ্রোহের যুগে সমস্ত বিপ্লবের অবসান করিবার নিমিত্ত কে উনি, কোন মূল সত্য দান করিবার জন্য ঐ মূর্ত্তি ধ্যানমগ্ন ও দৃঢ় নিশ্চয় ? যে সত্য আজ তোমার নিকট উপস্থিত সেই সত্যের সম্মান করিতে ভয় পাইও না, আবার বলি সত্যের নিকট অবনত মস্তক হও। তুমি জ্ঞানী, তুমি প্রাচীন, তুমি নবীন, তুমি গোঁড়া, তুমি উদার, তুমি পণ্ডিত, তুমি সিদ্ধ গুরু লাভ করিয়াছ, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের অবতার চিৎঘনমূর্ত্তি কোন যুগাবতারের শিষ্য তুমি, তুমি যেই হওনা, ভয় পাইওনা, সত্যের সম্মান কর। সত্যের সাধক কি ভাবে তাঁহার বন্দনা করেছেন তাহা দেখ।

"প্রবীণপ্রবর, নবীনকিশোর, অঙ্গ শ্বেতসার গুরু অবতার।
শ্যামঅন্তর, শ্যামনামধর, জগত অন্তর, জগত মাঝার।।
পদ্মাসনে শ্বেত পদ্মরাগমণি, নিন্দিয়ে উজলে চরণ দুখানি।
মধ্যে করাঙ্গুলি শুভ্রবন্ধগণি, নখরাজি শ্বেত শশিকোটি সার।।
শ্বেতাম্বরধর, শ্বেতমধ্যখান, তদুপরি শ্বেত লম্বোদর স্থান।
সহজ লম্বিত বাহু মধ্য খান, শ্বেত বিশাল হৃদয় বিস্তার।।
অপূর্ব্ব উন্নত স্কন্ধ মনোহর, চিবুক স্থাপিত কণ্ঠকূপোপর।
হ্রস্বগ্রীবা মুখ রচনা গোচর, শিখাদেশ শুভ্র অভ্র জ্যোতিঃ সার।।
ঈষৎ মিলিত নিমীলিত আঁখি, অন্তর্মগ্ন সর্ব্ব অন্তর নিরখি।
সদানন্দ শান্ত সুপ্রসন্ন দেখি, কঠিন কপট দয়া পারাবার।।
শাসনে আশ্বাসে বাক্যে লোকাচারে, বলিতে না পারি কি প্রেম বিস্তারে।
সে প্রেম না মেলে জগতমাঝারে, দেবাসুরনর মোহন সবার।।
সর্ব্বশাস্ত্রে যত লীলার আখ্যান তত্তোধিক লীলার প্রত্যক্ষ নিধান।
ভক্তি মুক্তি দিতে সদা ক্ষমাবান্, বলিতে না পারি কিছুই তাঁহার।।
তাঁর অন্তর্ধানে এ জীবন ভার, শোকাপনোদনের কিছু নাহি আর।

সে লাভ অন্তর্ধ্যানে না হয় আমার, ভরসা সে বিনে নাহি দেখি আর।।
কৃপামাত্র তাঁর সাধু সমাগম, অন্তরে আরাম কখন কেমন।
আশায় দীনের দিন যাপন, দীননাথ লাভ হবে কি আবার।।
ধরাধামে লোকে অবস্থানে যাঁর, গোস্পদ ভাবিত ভব পারাবার।
এখন সে ভব অকুল অপার, সে ছাড়া না হেরি পঙ্গুর নিস্তার।।
দয়াময় তোমাবিনে বয়ে যাই, যাই যাই আবার লাগি ঠাঁই ঠাঁই।
যা করিবে কর আর কেহ নাই, জীবন মরণে সমান আমার।।
পাপে তাপে দুঃখে তুমি হে সম্বল, শাসনে কাহারও বিনাশ না বল।
করি তোমা বল আছে এ দুর্ব্বল, হয় কিনা হয় পতিত উদ্ধার।।"

ইতি
শ্রীশ্রীমহাষ্টমী [সন্ধিক্ষণ]

জীবনী ও প্রচার বিষয়ে সমস্যা।

"শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী লেখা অতি দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকায় অনেকেরই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার কৃতী শিষ্যগণের মধ্যে কেহ তাঁহার সাহায্যে এই কার্য্যে তৎপর থাকিলে অনেক প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহে এত বেগ পাইতে হইত না। অধিক কি তাঁহার জন্ম তারিখের সন্ধান কেহই জানিত না, এইজন্য তাঁহার শিষ্যরা কখনও গুরুদেবের জন্মতিথি উৎসব করিতে পারেন নাই। এইবার তাহা সম্ভব হইবে। আমাদের সাহায্যে জনৈক উকিল তাঁহার জীবনীর কিছু লিখিয়াছেন, একটী ঘটনা ভিন্ন উহার অধিকাংশই আমাদের প্রদত্ত, উহাতে কিছু ভুলও আছে কিন্তু উকিল মহাশয় কোন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রাখেন নাই। জীবনী লেখার দায়িত্ব যথেষ্ট, আজকাল জীবনীর ছড়াছড়ি। গবেষণাবিহীন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিবিহীন

দু চারটী গল্পের জীবনীতে বর্ত্তমান যুগে কোন উপকার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। নানা জীবনী পড়িয়া অনেককেই ধাঁধাঁয় পড়িয়া জীবন নষ্ট করিতে দেখিয়াছি। অনেক জীবনীতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের অনুকরণে প্রথম হতেই মানুষকে দেবতা করে ফেলা হয় এবং অনেক কার্য্যকেই লীলা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কেবল মাত্র অলস কৌতূহল পূর্ণ করিয়া জীবনী লিখিবার ইচ্ছা আমরা ত্যাগ করিব। মানুষ দেবতা হতে পারে আর দেবতা হবার জন্যই মহাপুরুষদের পূজার আবশ্যকতা তাঁহার অধিক চেষ্টা হীনতা। এই জীবনী হইতেই প্রমাণিত হইবে যে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একটী উপযুক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কত! ঐরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যই এই গ্রন্থ। গ্রন্থলব্ধ অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট শ্যামাচরণ স্মৃতি ফণ্ডে প্রেরিত হয়।

১৯০৮/৯ খৃষ্টাব্দে কাশীতে কুক্কুর পদদলিত ছেঁড়া কাগজ ও নেকড়ার গাদার মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েক খানি গ্রন্থ পাইয়া সযত্নে রক্ষা করি, ইহাই আমার প্রথম সংগ্রহ। এ ছাড়া বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের নীলু পিয়ন ও শ্রীযুক্ত জয়রাম বাবু প্রভৃতির নিকট হইতে কয়েকখানি সযত্নে রক্ষিত পুস্তকও পাই। পুস্তকগুলি কাশীর ঠাকুরের ব্যাখ্যার জন্যই প্রসিদ্ধ। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে যখন যাহা পাওয়া যাইত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আমার একটা কার্য্য হইয়া পড়ে। অনেকে আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টার বিরোধী হইলেও বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণার্থে পুরীধামে গুরুধামের প্রতিষ্ঠাতা, সাধকপ্রবর, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাশয়, সাহিত্যাচার্য্য ও নানা আশ্রমের প্রবর্ত্তক, সদাসাধনমগ্ন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী, বেদান্তসরস্বতী মহাশয়, কৃতী সাধু কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেব দুকড়ি লাহিড়ী মহাশয়, নানা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস প্রণবানন্দ স্বামী, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে সৎসঙ্গ ও নানা আশ্রমের প্রবর্ত্তক সাধুসভাপতি

শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজীউ মহারাজ, নানা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, কৃতী সাধু, স্বামী কেশবানন্দ মহারাজজীউ, আর্য্যমিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা, গ্রন্থ, ও ঔষধাদির প্রচারক কৃতী সাধু আচার্য্য ঁপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং ঘরের মেয়েছেলেদের বা অন্য কাহারও নিকট যখন যাহা শুনিয়াছি, তাঁহার বহু পত্র ও বহুপুস্তক যাহা পাঠ করিয়াছি, বহুবৎসর ধরিয়া তাহার তুলনা, আলোচনা ও বিচার করিয়া বহু স্থানে সাক্ষাৎভাবে পরীক্ষা করিয়া এই পুস্তক লেখা হইয়াছে। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরতার সহিত নানা প্রমাণের সাহায্যে দেশ, কাল ও পাত্র পরীক্ষা করিয়া প্রকৃততথ্য অনুসন্ধান করা কত দুষ্কর ও ব্যয়সাধ্য তাহা অনুমান করা সহজ নহে। শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ গিরি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, ও ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু ও আরও দুই একটী ব্রহ্মচারী ভাইয়ের সাহায্য ব্যতীত এবং অনেকের আগ্রহ ব্যতীত এ পুস্তক ছাপান দুষ্কর হইত। এই সৎকার্য্যের জন্য সকলের উপর শ্রীভগবানের কৃপা পড়ুক। তাঁহার সম্বন্ধে দুচার কথা জোড়াতালি দিয়া সরকারি প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার চেষ্টা মাত্র।

জীবনী লেখায় সমস্যা।

তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রয়োজন কি? একজন কখন জন্মাইল ও কখন মরিল, কতদূর বিদ্যাচর্চ্চা করিল, সংসার ক্ষেত্রে কতবার আছাড় খাইল অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় পড়িয়া কেমন করিয়া হাবুডুবু খাইল কিংবা জীবনে কয়টা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্মিত করিল; — এইরূপ ঘটনার সমাবেশ না থাকিলে নাকি জীবনী লেখা বৃথা! মানুষের মন ঘটনারাগরঞ্জিত নাটক বা উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার কারণ মানুষ মানুষকে রিপুর বা সংসারের গোলমালে হাবুডুবু খাইতে দেখিতে চায় ও তাহার মধ্যেই সংযমের পরিচয় পাইয়া সৌন্দর্য্যের সন্ধান করে। কিন্তু একজন নির্ব্বিকার পুরুষকে যদি সাধারণ দুর্ব্বল মানুষের মধ্যে খাড়া করা যায় তবে মানুষ তাঁহার

মধ্যে নিজেদের স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতাগুলির সন্ধান না পাইয়া ও আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবার মত উত্থান পতন না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। একজন নির্ব্বিকার সিদ্ধ পুরুষের সহিত সাধারণ মানুষ যখন নিজের মনের মিল খাওয়াইতে পারে না তখন কয়েকজনমাত্র তাঁহাকে তফাৎ করিয়া উচ্চে তোলে এবং ঐ মহাপুরুষের পূজা স্বীকার করে, কিন্তু সে পূজার উপযুক্ত আয়োজনই বা কে করিতে পারে? যে মহাপুরুষের কথা লইয়া আজ আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহার উপযুক্ত পূজারী কোথা?

তাঁহাকে হৃদয়ের দেবতারূপে হৃদয়দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাঁহারা প্রতিনিয়ত তাঁহার ধ্যানপরায়ণ, যাঁহারা গুরুতে ও ভগবানে অভেদ জ্ঞান করেন, কৈ তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা তাঁহার কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন? মধুকর যখন মধুপানে মত্ত হয় তখন আর গুনগুন শব্দ করে না। যাহারা একবার সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্পর্শ পাইয়া জীবনকে ধন্য করিয়াছে তাহারা তাহা লইয়াই ভুলিয়া আছে: আমিই কেবল দূর হতে মিছে ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছি! মোট কথা তাঁহাকে কেহ চিনিল কিনা, তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করিল কিনা, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাঁহার জীবনে উপলব্ধ সত্যগুলিকে নিজেদের করিয়া লইতে পারিলে আমাদেরই কল্যাণ সাধিত হইবে, এই জন্যই ভাবের আদান প্রদান ভিন্ন পূজা, উৎসব, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, সৎকথা প্রভৃতি সমস্তই বৃথা আড়ম্বর হইয়া পড়ে। আবার কেবল মাত্র ভাষা দ্বারা সাধক বা তাঁহার সাধনাকে যতই বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করা হউক না কেন প্রকৃত পক্ষে তন্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। মুখ্যতঃ তাঁহার কর্ম্মময় জীবন হইতে অনেক বিষয় জানিবার সুযোগ উপস্থিত করাই জীবনী লেখার কথঞ্চিৎ সার্থকতা।

রহস্যোদ্ঘাটন সাধন সাপেক্ষ।

তাঁহার জীবনে যে সকল অলৌকিক রহস্যপূর্ণ দুজ্ঞেয় অবশ্য জ্ঞাতব্য সত্যের প্রকাশ ছিল সেই সকল সত্যের স্নিগ্ধ কিরণ ধারা ধারণ করিবার সামর্থ্য কি পাঠক, কি সমালোচক, কি লেখক কাহার কতটা আছে তাহা নিরূপণ করা কঠিন, এ স্থলে জীবনী লেখকের দায়িত্বই অধিক। যে তীব্র ও পূর্ণ সাধনার উপর তাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই সাধন বিনা তাঁহার কৃতিত্বের রহস্য উদ্ঘাটন অতি দুষ্কর সন্দেহ নাই। কেবল সাধনাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, গভীর অনুভূতির এবং ভগবৎকৃপারও আবশ্যকতা আছে।

সাধারণ সাহিত্যামোদীর মন সৌন্দর্য্য রসের আশায় ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ ও লিপিচাতুর্য্য দেখিতে চায়, মানব মনের একটা তরঙ্গের হাবুডুবু খেলা ফুরাইতে না ফুরাইতে আর একটি হাবুডুবু খেলা দেখিতে চায় ও কৌতূহলের নেশায় বাহিরের ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু সেরূপ মত্ততা থাকিতে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা কোথায়? যে সত্যের ঘনমূর্ত্তিকে পাইতে হইলে মনকে একেবারে স্থির করিয়া বসিতে হইবে, বাহিরের চঞ্চলতা থাকিতে তো তাহাকে পাওয়া যাইবে না! যে সত্যের উপলব্ধি মাত্রই মানবের পরমকল্যাণ সাধিত হয় এবং মানবের মধ্যে বৈদ্যুতিক চুম্বকশক্তির আকর্ষণের ন্যায় এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই সত্য, সেই শিবসুন্দর, একমাত্র সমাহিত কর্ম্মীসাধকের নিকটেই প্রকটিত, লোলুপ ভোগীর অদৃষ্টে তাহার স্বরূপের উপলব্ধি কখনই সম্ভব নহে। তাঁহার জীবনে প্রকাশিত সত্যগুলির কিছু আভাস যদি কেহ পাইতে চান তবে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় তৎকৃত ব্যাখ্যাত গ্রন্থগুলিতে পাইতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে যথাস্থানে সামান্য আলোচনা করিব।

মানুষকে আমরা যতটুকু দেখিতে পাই — মানুষ ঠিক ততটুকু নয়। মানুষের পশ্চাতে এক অনির্ব্বচনীয় বিরাট চৈতন্য লুক্কায়িত আছে — মানুষ সেই অনন্ত চৈতন্যশক্তির অনন্ত প্রকাশের একটী ক্ষুদ্র কেন্দ্র মাত্র। কে জানে কখন কোন মানুষের মধ্য দিয়া সেই অতিমানবের বিকাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সসীমের সহিত অসীমের সম্পর্কে বলা যায়—

"সাগর তুমি অপার আমি তোমার বুকের ঢেউ।
শান্ত হলে তুমিই থাক আর থাকে না কেউ।।"

আমি এইরূপ মানুষকে দেবতা, অবতার, মহাপুরুষ প্রভৃতি বলে থাকি। আমরা কাশীর ঠাকুরকেও মহাপুরুষরূপে পাইয়াছি। যোগিবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে, কাশীরঠাকুর বা লাহিড়ী মহাশয় বা শ্রীশ্রীঠাকুর বা যোগিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়া অনেকে আনন্দ পান সুতরাং আমরাও তাঁহাকে ঐ সব নামে অভিহিত করিয়াছি।

এই মহাপুরুষের জীবনে যে শক্তির প্রকাশ হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়া এক মহাবিপ্লবের অবসান করিতেছে ক্রমশঃ সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইতেছে। সুদূর আমেরিকাতেও লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত তাঁহাকে চিনিতে জানিতে ব্যস্ত। বর্ত্তমানযুগের আন্দোলনে যে ঐশী শক্তির লীলা চলিয়াছে তাহা কি আমরা দেখিতে ও বুঝিতে প্রস্তুত হইব না।

বর্ত্তমান যুগের আদর্শপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর কোন বৃথা আড়ম্বর, বৃথা হৈ চৈ বা দলাদলি আদৌ ভাল বাসিতেন না। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন নিজেকে প্রচার করিতে পছন্দ করিতেন না — তাই দেখিতে পাই অনেক প্রশিষ্য তাঁহাকে পরম গুরুরূপে অবগত নহেন। তাঁহার এইরূপ আত্মগোপনের ভাব দেখিয়া উদ্দেশ্য না বুঝিয়া

অনেকে তাঁহার জীবনী লেখা হইতে বিরত হইয়াছেন।

অনেকের ভ্রান্তি আছে যে ঁকাশীর ঠাকুর কখনও প্রচার উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যে উৎসাহ দিতেন না। "অন্যায়ভাবে প্রচার করিলে সৎবস্তুর প্রচার ত হয়ই না বরং কালে তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হয়।" এইরূপ কথাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত। অনেক সাহেবও গোপনে তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল। তিনি অসত্যভাবের বিরোধী ছিলেন। ঘটনাক্রমেও যাহারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার আচার ব্যবহার, আকৃতি প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতেন। যাহাদের চিত্ত দুর্ব্বল তাহারা তাঁহাকে হিপ্‌নটিষ্ট, যাদুকর বা বুজরুক বলিয়াই নিজের অবিশ্বাসী মনকে প্রবোধ দিতে দিতে চলিয়া যাইত। অনেকে স্পষ্টই তাঁহাকে জানাইত, "আমাকে দুই একটা ভেল্কি দেখাইয়া দিন" — তিনি ইহা শুনিয়া খুব হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিতেন — বড় একটা কিছু বলিতেন না — নিতান্ত বিরক্ত করিলে বলিতেন, " মাঝে মাঝে ভেল্কি দেখাবার জন্য বাজারে লোক আসে, সামান্য খরচ করিয়া সেই সব দেখিও।" তিনি একবার ঁজয়রাম ভট্টাচার্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "দেখ, হাটে মাঠে ধর্ম্মপ্রচার করিতে নাই, কালে সত্যের প্রচার খুব হইবে, সত্য কখন বেশী দিন চাপা থাকে না। আমি হাটে মাঠে হরিনামের গুণ গাইতে বারণ করি না কিন্তু কেমন করে যে সেই হরিনাম করিতে হয় সেটা পাত্রাপাত্র বিচার না করে যখন তখন যেখানে সেখানে যাতা বলতেই নিষেধ করেছি।" সমাজের এমন অবস্থাও হয়েছিল-যখন নাকি "মাগুর মাছের ঝোল, বল হরি হরি বোল," বলে মাছের ঝোল দিয়ে লোককে হরিনাম গেলাতে হয়েছিল। এ ব্যাপার সত্য হোক বা মিথ্যা হোক আবার যেন সে অবস্থা করে তোলা না হয়, এ হচ্ছে ক্রিয়ার যুগ, ক্রিয়া ও ফলের মধ্যে পরীক্ষার যুগ এবং যুক্তি তার পাছে পাছে আসে।

আবার বলিতেন, "লোকে আসল কাজ না করে ভাষায় পণ্ডিত হয়ে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে না।" কখনও বা জনৈক সাধুকে

বলিতেন, "দেখ তুমি যা বচন শিখে নিয়েছ তাতে দুনিযার লোক তোমাকে ভারি খাতিরই করিবে — ভাবিবে বুঝিবা লোকটী কত বড পন্ডিত এবং সাধক কিন্তু তুমি আসল কাজ করনা তাই কেউ যদি তোমার অন্তরটা দেখে তবে বলিবে বেটা যে হাডিরগু সেই হাডির গুই আছে, ভিতরে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই।" আবার বলিতেন "হাটে মাঠে কেবল ঠারে ঠোরে ধর্ম্মকথা বলিতে হয়, যার মন ধর্ম্মের দিকে সে আপনিই আকৃষ্ট হইয়া আসিবে।" কখনও বলিতেন, "উপযুক্ত অধিকারীকে সৎগুরুর নিকট লইয়া যাইবে, পরস্পর ভগবৎ বিষয়ে আলোচনা করিবে, এই জন্যইত বই লেখা হইল, "মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। তেষাৎ সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তৃং যেন মামুপযান্তিতে।।" এইরূপে তিনি নিত্য গীতা পাঠ করিতে বলিতেন প্রকৃতপক্ষে তিনি মোটেই প্রচারের বিরোধী ছিলেন না তবে প্রচারের প্রণালী বিশেষের বিরোধী ছিলেন অর্থাৎ অর্থলোভে অথবা খুব খোলাখুলি ভাবে প্রচারে তাঁহার মত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে প্রচর কার্য্য লইয়া হয়ত হৈহৈ পডিয়া যাইতে পারে ফলে কিন্তু সত্যের প্রতি দৃষ্টির অভাবে গোঁড়ামির জন্য সুদুর ভবিষ্যতে তাহাই লোকের মনে অশ্রদ্ধা আনয়ন পূর্বক প্রচারের বিঘ্নই ঘটাইতে পারে।

প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

আবির্ভাব ও তিরোধানের কাল নির্ণয়, নদীয়াস্থ ভদ্রাসন বা বাস্তু ভিটার পরিণাম, সরকার পরিবারের তদানীন্তন শিবমূর্ত্তি, নদীয়ার শিশু জীবন, পূর্ব্বপুরুষদিগের কাশীবাস, তখনকার দেশকালের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, পিতৃমাতৃপরিচয় ও বাল্য শিক্ষা, সংস্কৃত শিক্ষা ও বেদাভ্যাস, বাল্য পরিচয়, যৌবন, চাকরি, দীক্ষার কাল নির্ণয়।

যুগপরিবর্ত্তনের মূলে

যোগিরাজ

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ি।

যোগিরাজস্মৃতি।

প্রথমখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের বংশ পরিচয় স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিষয়।

বেদ — ঋক্।
বেদের শাখা — আশ্বলায়ন।
ধারা — যোগের ধারা। বাংলাদেশে প্রাচীন বৈদিক যুগের যোগ প্রভৃতির ধারা ছিল না বা লোপ পাইয়াছিল। আদিশূর আনীত অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ঋষি তুল্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ নানা ধারা এক সময়ে বাংলা দেশে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বংশ ও শিষ্য পরম্পরায় কেবল উপযুক্ত পাত্রেই সাধন সাপেক্ষ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা রক্ষিত হইতে পারে, এই জন্য লোকে বংশ বা গোত্রের গৌরবকে উচ্চে স্থান দিত। আধুনিক, নীতিচরিত্রবিহীন, অর্থকরী, চরিত্রগত ব্রতাদির অনুষ্ঠান শূন্য, পুঁথিগত বিদ্যায় এরূপ গৌরবের অবসর নাই বটে কিন্তু শিক্ষা যখন গুরুগৃহবাস-সাপেক্ষ ছিল ও রীতিমত আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের ব্যাপার ছিল তখন বংশ বা গোত্র লইয়া গৌরব স্বাভাবিক। গুরুগৃহ বাস লোপ হইলেও লোকে বংশগত শিক্ষার ধারাটায় জীবন পাইত। হায়! হায়! ব্রহ্মচর্য্য,

কৌমার্য্য, ঊর্দ্ধরেতত্ব, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি যে অলীক কল্পনা হইয়াছে, একমাত্র আলস্যই যে সকল সর্ব্বনাশের মূল তাহা যথাস্থানে দেখান হইবে। তখন বংশগত শিক্ষার ধারা লোপ করিলে অত্যন্ত নিন্দা প্রভৃতির ভয়ই মানুষকে পদস্থ রাখিত।

গোত্র — শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ প্রণেতা যোগী ও ভক্তবীর ভক্তি ও যোগসূত্রকার শাণ্ডিল্য মুনির গোত্র। শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ ও ভক্তিসূত্র অবশ্য পাঠ্য। এখন যেমন জেলা তখন তেমন নানা গোত্রের নাম দিয়া অধিকাংশ দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এক একটী সহরের অপেক্ষাও বৃহৎ, সহস্র সহস্র ছাত্রের বাসোপযোগী, এবং অন্যান্য আশ্রম বা দেশ হইতে পৃথক রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে গোচারণ স্থানে বেষ্টিত, নির্দ্দিষ্ট সীমাযুক্ত আশ্রমের নাম গোত্র। এক একজন সুদক্ষ ঋষির প্রবর্ত্তিত আশ্রম বা গোত্র সেই ঋষির নাম পাইত, তাঁহার বংশ বা শিষ্যেরা ঐ গোত্রনামে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেন। সকলেরই গোত্রগত বা ধারাগত শিক্ষার পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য, ইহাতে আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস ধরা পড়িবে।

বংশ — আদিশূর আনীত যোগিরাজ ভট্টনারায়ণ প্রমুখ নিত্যানন্দ মিশ্রের বংশ। কৌলীন্যাদি আচার ও নিষ্ঠাজন্য ইঁহার প্রসিদ্ধি। বংশাবলী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ — কনোজী বা কান্যকুব্জাগত। আধুনিক কানপুরই প্রাচীন কনোজ।

সন্তান — রায় দুর্গাদাস লাহিড়ীর সন্তান। পর্য্যায় ত্রিশ। কলাগাছার রাজা রায় শম্ভুচন্দ্রের নিকট প্রভূত ভূসম্পত্তি ও খ্যাতি প্রাপ্তি জন্য উল্লেখযোগ্য। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

গাঁই — কৌলীন্যাদিহেতু রাজদত্ত গ্রাম বংশ পরিচয়স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শিক্ষার প্রভাব বিস্তার জন্য রাজারা উপযুক্ত পাত্রে গ্রামদান করিতেন। রাজদত্ত গ্রাম হইতে ইঁহাদের লাহিড়ী গাঁই, লাহিড়ী নামক গ্রামপ্রাপ্তির পর এই বংশের পদবী লাহিড়ী হইয়া গিয়াছে।

প্রবর — তিন প্রবর-শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। শিক্ষার্থে-নানাকারণে এই তিনজন প্রাচীনের নাম স্মরণীয়।

শ্রেণী — বারেন্দ্র। বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ তৎকালে বারেন্দ্র-ভূম ছিল। বল্লালসেন ঐ বিভাগ করেন।

কয় কড়া — বর্ত্তমান বগুড়া জিলার অন্তর্গত তৎকালীন লাহিড়ী গ্রামে লোকনাথ প্রভৃতি বাস করিতেন। লাহিড়ী গ্রাম ছাড়িয়া কেশব নামক ব্যক্তি হইতে নকৈড় নামক স্থানে এই বংশের পরপর পুরুষেরা থাকে। ইঁহারা বারকড়া শাখা হইতে পৃথক। নকৈড় ছাড়িয়া নাটোরের দক্ষিণস্থ হালসা গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থানের কথা পরে জানা যায়। আরও পরে ইঁহারা ঘুরণি, কৃষ্ণনগরে থাকেন।

নিবাস — পূর্ব্বনিবাস কৃষ্ণনগর ঘুরণি, বর্ত্তমান নিবাস ঁকাশীধাম।

কুল — কুলীন। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং।"

পর্য্যায় — ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৭ পর্য্যায় বা থাক। ইঁহার পিতা ঁগৌর মোহন ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬ পুরুষ।

ওঁ

আবির্ভাব ও তিরোধান।

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম তারিখ কাহারও জানা ছিল না। একখানি পুরাতন খাতায় ইহা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মতভেদ করিয়া অনেকেই পত্রও দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট জন্ম তারিখ নির্দ্ধারণের কোন উপায় ছিলনা কারণ পারিবারিক সংস্কার বশতঃ দেহ রক্ষার সহিত তাঁহার কোষ্ঠীও নাকি রাখিতে নাই বলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল। সুতরাং লোকে তাঁহাকে যত বয়সের বলিয়া জানিত বলে, তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইত এবং বিবাদের কারণ থাকিয়া যাইত কিন্তু একজন আত্মীয়ের খাতায় ও কাগজপত্রে তাঁহার জন্ম তারিখ লিখিত থাকিতে দেখিয়াছি এবং অন্যান্য বহু ব্যাপার অবগত হইয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া অকাট্য প্রমাণ ও সন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া তবে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি। অদম্য অনুসন্ধান প্রবৃত্তি না থাকিলে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বাতুলতামাত্র হইত। এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ আগ্রহ বা তর্ক করিতে চাহেন তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বা টিকিট সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন। সকলের কৌতূহল নিবৃত্তির যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

জন্ম

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ ১২৩৫ সালে ১৭৫০ শকে ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, কৃষ্ণপক্ষীয়া সপ্তমী তিথিতে, একপ্রহর কালে (অনুমান প্রাতঃ ৯টার সময়) শারদীয়া দুর্গা পূজার এক পক্ষকাল পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত, কৃষ্ণনগর ঘুর্ণীতে, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জগৎ গৌরবরবি শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌর মোহন সরকার (লাহিড়ী); ইঁহার মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী।

গৌরমোহনের দুইপত্নী ছিল। প্রথমা পত্নী দুই পুত্র সারদাকান্ত. চন্দ্রকান্ত এবং এক কন্যা স্বর্ণময়ীকে রাখিয়া ১২২৫ সালে শ্রীক্ষেত্র যাত্রাকালে পথিমধ্যে দাঁতন নামক স্থানে পরলোকগমন করেন। অতঃপর গৌর মোহন দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবীর পুত্রই শ্যামাচরণ। ১২৪০ সালে সুলক্ষণা নাম্নী শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা ভগ্নী জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং ইঁহারা তিন ভাই ও দুই ভগ্নী ছিলেন। ১৮৪৯ শকে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, ১৩৩৪ সালে ৩১শে ভাদ্র, শনিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে শারদীয় দুর্গা পূজার একপক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁহার শতবার্ষিক জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থানে একটা সভার আয়োজন হইবার সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ নারায়ণ জানেন।

তিরোভাব।

৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর সন ১৩০২ সাল ১০ই আশ্বিন ১৮১৭ শকাব্দে দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথিতে ঠিক সন্ধিক্ষণে বলিদানের সময় কাশীধামে শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষা করেন। কারবানকল বা পৃষ্ঠাঘাত (পিঠেতে এক রকমের ফোড়া) তাঁহার লীলা শরীর ত্যাগের এক উপলক্ষ ছিল।

কৃষ্ণনগর ঘুরণিতে ভদ্রাসন বা বাস্তুভিটার পরিণাম।

বিদ্যাবুদ্ধিধর্ম্ম প্রভৃতি সকলদিকেই নদীয়ার খ্যাতি। নদীয়া বা নবদ্বীপের মধ্যে প্রবাহিতা গঙ্গা ও পদ্মার শাখা জলাঙ্গী ওরফে খড়েনদী অনেকবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক প্রাচীন স্থান ধ্বংস করিয়াছে। নদীর অনেক শাখা প্রশাখা ও জলশূন্য খাদ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে সামান্য বর্ষাতেই এখানে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিত। এখনও ছেলেরা বৃষ্টির সময় বলে "বৃষ্টি এল টাপুর টুপুর,

নদেয় এল বান'' ইত্যাদি, একথাটি যে খাঁটি অভিজ্ঞতারই ফল তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। জলাঙ্গীর উৎপাতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থানও নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। ১২৩৭ সালে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় খড়ে নদীতে অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক ভাঙ্গন ধরিতে আরম্ভ করে, এই খড়ের ধারেই গৌরমোহনের বসতবাটী প্রভৃতি ছিল। তাহার অধিকাংশভাগই ১২৩৭ সাল নাগাদ নদী গর্ভে গিয়াছে। বাড়ীর চারিধারে যে বাগান ছিল তাহারই লুপ্তাবশিষ্ট সামান্য একটু কোণে একটা আম্র বৃক্ষ শোকাতুরের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী কালের সাক্ষীস্বরূপে এখনও খড়ে নদীর তীরে ঘুর্ণীতে দাঁড়াইয়া আছে; ইহার একটা ছবি রক্ষিত হইয়াছে। ১২৩৯ সালে ভাদ্র মাসে যখন গৌরমোহন কাশীধাম হইতে ঘুর্ণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন সম্ভবতঃ তখন তিনি কোন বাসা বাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন বসতবাড়ী প্রভৃতি সম্পূর্ণ জলসাৎ হইয়া গিয়াছে। ''দেশে ডাঙ্গা ছিল না, ডাঙ্গায় ঘর ছিল না, ঘরে মানুষ ছিল না'' এমন বন্যাই এই নদীয়া জেলায় বহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাদের বাসস্থানের শেষ চিহ্নের আলোক চিত্র লওয়া হইয়াছে। অনেকেই বলেন তাঁহাদের বাসস্থানের একটা সীমা নদীর অপর পাড়ে যাইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত বাসস্থানটাই নদীগর্ভে পড়িয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থানও পারিপার্শ্বিকসম্বন্ধযুক্ত স্থানের বর্ণনা দ্বারা ঐ স্থানটিকে স্থায়ীভাবে বোধগম্য করিয়া রাখিবার জন্য মানচিত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সরকার পরিবারের শিব ও সাধারণের উৎসব।

গৌরমোহনের প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দির বন্যার প্রকোপে একেবারে জলমগ্ন হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। কিছুকাল পরে একটি স্ত্রীলোক একদিন প্রত্যুষে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া দেখে যেন স্বয়ং শিব ঠাকুর আসিয়া নদীর একটী অংশ দেখাইয়া বলিতেছেন, ''দেখ, আমি

নদীতে এইখানে আছি আমাকে উদ্ধার করিয়া একটি মন্দিরে রাখিতে বলিও।" এই স্বপ্নের কথা শুনিবার পর অনেক লোক নদীতে সেই স্থানে যায় এবং বৃহৎ শিবলিঙ্গটি পাইযা চারি পাঁচজনে বহু কষ্টে উহাকে উদ্ধার করে এবং একটী নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে, ঐ স্থান ঘূর্ণীর শিবতলা বলিযা প্রসিদ্ধ। এখনও মন্দিরে ঐ শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ মন্দিরের আলোক চিত্র রক্ষিত হইযাছে। জল হইতে পাওযা যায বলিযা ইঁহাকে জলেশ্বর মহাদেব নাম দেওযা হইযাছে। এই মন্দিরের নিকটেই গৌরমোহনদের বসতি ছিল। এই শিব যে গৌরমোহন শর্ম্মার তাহা সকলেই জানিত কিন্তু তখন তাঁহারা দেশত্যাগী। এই মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গনে শিবরাত্রের সময প্রতি বৎসর চারি পাঁচশত লোক একত্রিত হইযা চারি পাঁচদিন ধরিয়া পূজা ও নানা উৎসব করেন। কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা, দরিদ্র নারায়ণ ভোজন প্রভৃতি এই উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ইহা এখনও সাধারণের সম্পত্তি।

মুক্তকেশী দেবী নিত্য গৃহে স্থাপিত শিবের আরাধনা করিতেন। পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না ইহাই তখনকার বিধি ছিল, ঠাকুর পূজার সময় শিশু শ্যামাচরণ বালক সুলভ চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় সংস্কারসুলভ প্রসন্ন গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া পূজা দেখিতেন ও প্রণামাদি করিতেন, হিন্দু গৃহে ইহা বিশেষ ব্যাপার নহে। ঘুরণির বৃদ্ধ রামরতন সরকার গল্প করিতেন যে ইঁহাদের বাড়ী হইতে খড়ের ধার বেশী দূর ছিল না। স্নানের সময় ছেলেরা উৎপাত করিয়া বেড়াইত, নানারূপ দুষ্টামি করিত কিন্তু শিশু শ্যামাচরণ কখন কখন কি এক ভাবে তন্ময় হইয়া নদীর তীরের দিকে উদাস প্রাণে ছুটিয়া যাইতেন আর সেই বালির উপর পদ্মাসন করিয়া সরলভাবে বসিয়া পড়িতেন, কখন কখন সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতেন এরূপ কি যে তিনি করিতেন তাহা তিনিই জানিতেন। স্নানের সময় যাহারা ঘাটে যাইত তাহারা তাঁহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিত, "আহা! দেখ যেন শিব ঠাকুরটি!" মুক্তকেশী দেবী অনেক সময় তাঁহাকে খড়ে

নদীর ধার হইতে টানিয়া আনিতে যাইতেন তাই চতুর শিশু আসনস্থ হইয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত নিম্নাঙ্গ মাটির মধ্যে প্রোথিত করিতেন, কখন বা আকন্ঠ বালুকামগ্ন হইয়া আসনস্থ হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতেন। মাতা অনেক আকর্ষণ করিয়াও বালককে গৃহে ফিরাইতে পারিতেন না। যখন রৌদ্রের প্রাখর্য্য হইত তখন তিনি সেই নদীর তীর ত্যাগ করিতেন।

ঘুরণি ত্যাগ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষগণ একাদিক্রমে কাশী বাস করিতেন, কাশীধামে তাঁহাদের একখানি বাসা বারমাসই থাকিত। অন্ততঃ তিনপুরুষ একটী করিয়া বাসা থাকিত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তখন আট দশ টাকায় বড় বড় প্রাসাদ তুল্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইত; পশ্চিমে গাজীপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের ব্যবসায়বাণিজ্য ছিল, বোধ হয় তাঁহারা প্রায়ই জলপথে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিতেন। ঐ সময়ে ব্যবসায়ীদের সাহায্যে হুন্ডি ডাকের ব্যবস্থা ছিল। একজন ব্যবসাদারের নানা স্থানে দোকান বা গদী থাকিলে, ঐ সকল বিভিন্ন স্থানের লোকেরা এক স্থানে টাকা জমা দিয়া ব্যবসায়ীর সাহায্যে অন্য স্থানে পত্র দিলে ঐ সকল গদীতে আদিষ্ট লোককে সনাক্ত করিয়া টাকা দিত। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। ইহাতে চোর ডাকাতের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইত এবং কেবল ডাকে পত্রের সাহায্যে কাজ হইত। ইঁহাদের গদীতেও হুন্ডি ডাক চলিত।

১২২৩ সালে ৯ই কার্ত্তিক শিবচরণ সরকার (শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতামহ), মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্য এক আত্মীয়াকে লইয়া নৌকাযোগে কাশীযাত্রা করেন।

গৌরমোহন, তাঁহার স্ত্রী, ও কন্যা স্বর্ণময়ী ১২৩৮ সালে ১৯শে বৈশাখ সোমবার অমাবস্যার দিবস কাশীধামে ৪৯নং গনেশ মহাল্লায়

তিনটা শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন। শিব স্থাপনার পর তাঁহারা ঘুরণিতে ফিরিয়া যান। ইতি পূর্ব্বেই ১২৩৭ সালের বন্যায় তাঁহাদের গৃহ মন্দিরাদি জলসাৎ হইয়াছে।

পুনরায় ১২৩৮ সাল ২রা অগ্রহায়ণ, গৌরমোহন সরকার, তাঁহার মাতা, পিতামহী, কন্যা স্বর্ণময়ী, দ্বিতীয়া পত্নী, দুই পুত্র, বৈবাহিকা ও মালিক মদক কাশীযাত্রা করেন। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম কাশীযাত্রা, যখন তাঁহার বয়স তিন বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত তখন কলিকাতায়। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাতে তাঁহাদের এক বাসা হইয়াছিল, বন্যায় বাড়ীঘর ভাসিয়া যাইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে ১২৩৪ সালে গৌরমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকান্ত সরকার কোন সাহেবের বাড়ীতে কলিকাতায় চাকরি পাইয়াছিলেন, ঐ সময়ে গৌরমোহন কলিকাতায় থাকিতেন। সুতরাং ১২৩৪ সালের পর যখন ১২৩৭ সালে ঘরবাড়ী নষ্ট হয় তখন অধিকাংশকাল গৌরমোহনের কলিকাতায় অবস্থান খুবই সম্ভব ছিল। শ্যামাচরণকে লইয়া গৌরমোহন ১২৩৯ সালে ৪ঠা ভাদ্র কাশীধাম হইতে সপরিবারে শেষ বার ঘুরণি যান; পুনরায় ১৮৩৩/৩৪ খৃঃ অঃ ১২৪০ সাল ১৩ই পৌষ সমস্ত পরিবার লইয়া গৌরমোহন চিরকালের মত ঘুরণি ত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন ও প্রায় নয় সপ্তাহ কাল নানাস্থান ঘুরিয়া দীর্ঘ জলযাত্রার পর ১৮ই ফাল্গুন কাশীধামে পঁহুছেন। ইহার পর গৌরমোহন স্বজনবর্গ লইয়া কাশীতে স্থায়ীভাবে নিবাস স্থাপন করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত রাধানাথ সরকার ইঁহাদের সঙ্গেই ছিলেন। প্রায় পাঁচ বৎসরকাল কাশীতে খালিসপুরা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া অবশেষে রাধানাথ ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১২৪৫ সালে মদনপুরায় ডি ৩২/২৪২ নং বাটী ক্রয় করেন এবং এইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পঠদ্দশার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এই বাটী অদ্যাপি বিদ্যমান।

দেশকাল ও পাত্রের অবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিতে হইলে তখনকার যুগের একজন হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হইতে হইবে নচেৎ তিনি যে সে যুগের প্রভাবের কত উপরে তাহা জানা দুষ্কর হইবে। লর্ড বেন্টিকের সময় হইতে কার্জ্জনের শাসনকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ১৮২৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে কত প্রভাব আসিয়াছে ও গিয়াছে, কত ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। কোম্পানির রাজত্বের সময় পশ্চিমে তখনও রণজিৎ সিংহ ও সাধু হরিদাসের অলৌকিক যোগপ্রভাব বর্ত্তমান। আফগানিস্থান, সিন্ধুদেশ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে নিত্যযুদ্ধ, শিখযুদ্ধ, গুজরাটযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি কত ব্যাপার মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬১ সালে ৩৩ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত তাঁহার যোগদীক্ষা লাভ হয় নাই। তিনি দেশের হাওয়ার মধ্য দিয়াই নিজকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ক্ষেত্র অনুসারে উপযুক্ত বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, মানুষের বেলাও এ কথাটি খাটে। সযত্নে রক্ষিত উদ্যানের বৃক্ষ, আর অশেষ জল ঝড় সহ্য করে উচ্চ পাহাড়ের উপর খোলা বাতাসে দাঁড়াইয়া আছে যে বৃক্ষ, এ দুটীর পার্থক্য অনেক। একটা ভীষণ পরিবর্ত্তনের মুখে একটা সন্ধিক্ষণে যাঁহারা সকল মানব জাতিকে সত্যের পথে চালিয়ে নিয়ে যান তাঁহাদের সঙ্গে শান্তির সময়কার নেতাদের পার্থক্যও অনেক। পরিবর্ত্তনের মধ্যেই শক্তির পরীক্ষা। তখন যাহারা পর্ব্বতের মত অচল অটল হইয়া সকলকে নিয়ে গড়ে তুলতে পারে তাহাদের ক্ষমতা বড় কম নয়!

মানুষ .যেমন করেই বড় হউক না কেন, আচারে, বিচারে, আহারে, বিহারে, ভাষায়, চিন্তায়, সকল বিষয়েই দেশ ও কাল অনুসারে মানুষ গড়িয়া উঠে। একটা বেসুরা, বেতালা, সম্পূর্ণ নূতন কিছু গড়ে উঠলেও সেটার ভিত্তি হয় পুরাতনের উপর। সেই

পুরাতনের সহিত নূতনের অনেক কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে। প্রাচ্যের আদর্শ ও পাশ্চাত্যের প্রভাব এই দুইটীর যখন ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত, ভারতের ঘরে ঘরে যখন বৃদ্ধারা সায়ংকালে চরকা কাটা ছাড়ে নাই, সেই মোটাধুতিচাদুরে সভ্যতার যুগে, যখন বৃদ্ধাদের বিপদসঙ্কুল পায়ে - হাঁটা তীর্থ যাত্রার গল্প, অথবা দধীচি, শিবি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জনক, নচিকেতা, হরিশ্চন্দ্র, রাম, আরুণি, একলব্য, পঞ্চপান্ডব প্রভৃতির গল্প না শুনিলে শিশুদের ঘুম হইত না, যখন পূজায়, উৎসবে নানা ব্রতানুষ্ঠানের সময় ছেলেমেয়েরা ভক্তিতে মাতোয়ারা হয়ে ভগবানকে পাইবার জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িত, যখন ইংরাজী ভাষাকে পাপ ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া ঘৃণা করিয়া লোকে শিক্ষা ব্যাপারে এক বিভ্রাট উপস্থিত করিযাছিল, যখন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিবার জন্য বিদ্যার্থীকে ধর্ম্মনাশের শঙ্কায় পিছিযে আসতে হত, যখন মধুসূদন গুপ্ত প্রথম মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার তোপধ্বনি করিয়া একটী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বলিযা ঘোষণা করিতে হইয়াছিল; যখন ধর্ম্ম বলিতে কেহ কেহ বা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ, নানা আচার, এমন কি, শুইতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে নানা ব্যবস্থা অথবা ন্যায় এবং ব্যাকরণের কচকচি ভিন্ন আর কিছু বুঝিতে বা বুঝাইতে চাহিত না, যখন একদিকে বিলাসলালসা ও অপর দিকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের মহিমা নানাভাবে পাশাপাশি হাজির হয়ে মানুষের মনের মধ্যে ভাবের খিচুড়ি পাকিযে দিতেছিল; অতীতের প্রভাব যখন বর্ত্তমানের প্রভাবের সহিত একটা ধাঁধার সৃষ্টি করিতেছিল, তখনও সমুদ্র বিধৌত চরণা হিমাদ্রিভূষিতা ভারতভূমির জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই আর্য্যঋষিদের ধর্ম্মের ভাব জড়ান ও মাখান ছিল। এই রকম একটা ওলট পালটের সন্ধিক্ষণে অনেক বড় বড় তেজস্বী কর্ম্মী সাধক দেশের সমাজের ও ধর্ম্মের - সকল দিকেরই কল্যাণের জন্য প্রকটিত হইয়া পড়েন। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেমন আলোর প্রয়োজন এই সমস্ত সত্যাশ্রয়ীর জীবনও আমাদের তেমনি আদরের জিনিষ।যদি ভারতীয় আর্য্য শিশুসন্তান জন্মাবধি ইউরোপীয় পরিবারে লালিত পালিত হইয়া তাহাদের হাব- ভাবে অন্য

জীব হইয়া উঠে, যদি তাহার সহিত আর্য্য সন্তানের ভাব -ভাষা কিছুরই সাদৃশ্য না থাকে তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার জীবনে দুইটী দেশের প্রভাব কিছু না কিছু কাজ করেছে। তা সেটা কতগুলি আচারের প্রতি শ্রদ্ধার দিক্ দিয়েই হউক আর চাই অশ্রদ্ধার দিক্ দিয়েই হউক। ইহার একটী নদীয়ার কৃষ্ণনগর অপরটি কাশী।

ধর্ম্মচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য নদীয়ার যে প্রভাব তাহার কিছু কিছু কৃষ্ণনগরে ছিলই, কারণ কৃষ্ণনগরে রাজার বাস। ধর্ম্ম ও বিদ্যায় নদীয়া যেমন বিখ্যাত কাশীধামও প্রাচীনকাল হইতে উভয় বিষয়ে গৌরবান্বিত। ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, সাহিত্য চর্চ্চা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার জন্য নদীয়ার যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। নদীয়া নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরও আশ্রয় স্থল। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় এই নদীয়াতে ছিল। আবার হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি কত শাখা সম্প্রদায়ও এখানে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই কত শাখা এখানে দেখা যায়; আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজে প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

কাশীধামেও নানকপন্থী, নাগা, উদাসী, কবীরপন্থী, গোরখপন্থী, শঙ্করাচার্য্যের দশনামী, শিবদয়ালসিংহের রাধাস্বামীপন্থী, কত সম্প্রদায়, কত মহাপুরুষের ভক্তবৃন্দ ও ধর্ম্মের কত আখড়া যে তাঁহার সময় ছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এইরূপ মোটামুটি না গণিয়া এই সকল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গণনার দ্বারা তখনকার সমাজের অবস্থা বিশেষ প্রকটিত হয়। এই দুই স্থানেই শ্রীশ্রীঠাকুর লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত।

বংশপ্রভাব।

মানুষের অন্তরটা দেখিতে হইলে বংশপ্রভাবটা কিছুতেই বাদ

দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ তখনকার সময়েও বংশমর্য্যাদা বলিয়া একটা জ্ঞান ছিল। তখনও ইংরাজ রাজত্বের মনোমোহন প্রভাব ভারতবাসীর মনে দৃঢভাবে স্থাপিত হয় নাই — সবেমাত্র তাহার সূচনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেব গৌর মোহন শর্ম্মা সর্ব্ব বিষয়ে একজন সদাচার সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ দয়ালু জমিদার ছিলেন। তিনি প্রাচীন রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন সভ্যতাকে মাথা পেতে নেওয়াকে বড়ই ভয় করিতেন এ হিসাবে তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু বলা চলে। বংশ প্রভাব আলোচনা করিতে যাইয়া কেবল পিতৃপ্রভাব লক্ষ্য করা সে কালের রীতি ছিল না। কারণ তখনও পূর্ব্ব পুরুষ দিগের নাম, ইতিহাস, জীবন যাপন পদ্ধতি প্রভৃতি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধারা বালক বালিকাদিগকে শিখাইতেন। কয়েক বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন রীতিনীতি যেন ইন্দ্রজাল প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দশ, বিশ, বা পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের আচরণ হইতে আমরা এত তাড়াতাড়ি পেছিয়ে তফাৎ হয়ে যাচ্ছি যে সে সকল ব্যাপার শুনিলে স্বপ্ন বলেও মনে হয় না। এই জন্য পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন। ইতিহাসে পাওয়া যায় বৌদ্ধ সেন বংশীয় রাজাদের প্রভাবকালে বাংলাদেশে মাত্র সাত শত ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যেও বৈদিক ক্রিয়া যুক্তি হীন হইয়া লোপ পাইয়া ছিল। আদিশূরই বাংলাদেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। আদিশূর তীর্থ ভ্রমণ জন্য কান্যকুব্জে যাইয়া সেখানের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কন্যা পিতৃগৃহে চান্দ্রায়ণ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, পতিগৃহে আসিয়া নিজের ব্রত উদযাপন জন্যপাঁচটি ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন। আদিশূর বঙ্গদেশের পাঁচটী বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে উপস্থিত করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজ্ঞীকে যজ্ঞার্থে অগ্নি ও জল আনয়ন করির্তে বলিলে রাজ্ঞী তাহাদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনে অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। কারণ রাজ্ঞী কনোজে দেখিয়াছিলেন যে বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ইচ্ছামাত্র মন্ত্র দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির সংস্থাপন করিতে পারিতেন। রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা রাজ্ঞী চন্দ্রমুখী এইরূপ বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রমুখী কথয়তি কিমাশ্চর্য্যম্। ভবদ্দেশাৎ ব্রাহ্মণা

বেদবর্জ্জিতাঃ, মন্ত্রেণ ক্ষমতাহীনা বহ্নিসংস্থাপনাদিকম্। তৎ কথং মৎ ব্রতং ভবিষ্যতি ইত্যুক্তা ক্রোধাগারে প্রবিশ্যতি।'' অতঃপর রাজ্ঞী চন্দ্রমুখী পিতা চন্দ্রকেতুর নিকট যজ্ঞার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। প্রথমতঃ প্রেরিত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বিলাসী দেখিয়া রাজা অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন। তখন আশীর্ব্বাদ জন্য গৃহীত জল তাঁহারা কোন শুষ্ক বৃক্ষে নিক্ষেপ করিলে সেই বৃক্ষ সতেজ ও ফল ফুলে শোভিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রাজা নানারূপে তাঁহাদের তুষ্টি সাধন করিলে তাঁহারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন বটে কিন্তু প্রতিগ্রহ করিয়াছেন ও বৈদ্যের যাজন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কান্যকুব্জ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন। সেই অশীতি পর বৃদ্ধ ঋষিদের বংশ এখন বাংলা দেশের সর্ব্বত্র। তাঁহারা অতি বৃদ্ধ হইযাও যে নবীনের ন্যায় সংসার করিয়াছিলেন ইহা আজকালকার দিনে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। সেই পঞ্চ ঋষির বংশেও এখন বেদক যজ্ঞ বা যোগাধিকার দেখা যায় না। চেষ্টা করিলে যে ঐ সকলের পুনরুদ্ধার হয় না তাহা নহে। শ্রীশ্রীঠাকুরই তাহার প্রমাণ। দুঃখের বিষয় যে যোগাধিকার প্রত্যেকেরই ছিল এখন লোকে শিখিবার উপায় থাকিতেও অজ্ঞতা নিবন্ধন সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন বা গৌরব অনুভব করেন না।

লাহিড়ী গাঁই।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধযোগী, মহর্ষি ভট্টনারায়ণের অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষস্থ পীতাম্বর শর্ম্মা বগুড়ার অন্তর্গত যে স্থান প্রাপ্ত হন তাহার নাম লাহিডী গাঁই। পীতাম্বরের বংশধরেরা লাহিডী গ্রামের ব্রাহ্মণ বা লাহিডী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার অধস্তন যোড়শ পুরুষস্থ দুর্গাদাস।

মুর্শিদাবাদের নিকট (তখন মুখসুদাবাদ) কলাগাছার রাজা শম্ভুচন্দ্র রায় দুর্গাদাস লাহিড়ীকে বেদজ্ঞ ও সাধন সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে

আপন কন্যা দান করেন। ঐ রাজার আর কেহ ছিল না। তিনি আপন রাজ্য দুর্গাদাস লাহিড়ীকে দান করিয়া তাহাকেই বাঙ্গা করিয়াছিলেন। এই জন্য বংশ পরিচয় স্থলে এই বংশীয় সকলেই নিজকে দুর্গাদাসের সন্তান বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্রই প্রথম নবাব সরকারে কোন সম্ভ্রান্ত পদ গ্রহণ করেন ও সরকার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই সরকার খ্যাতি এই বংশে প্রচলিত থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই খ্যাতি ব্যবহার করেন নাই। হরি লাহিড়ী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্তম পুরুষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রপিতামহ রামবল্লভের সময় নাটোর রাজ্যের বিস্তার। নাটোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনই তখন রাজস্ব অনাদায় বা অন্যকোন ছলে বা বলক্রমে অনেক জমিদারী ভ্রাতা রামজীবনের নামে করিয়া যান। রাজা রামজীবন নাকি জবরদস্তি করিযা চড়াও হইয়া রামবল্লভের জমিদারী দখল করিয়া লন।

সপ্তম মোগল সম্রাট বাহাদুর সা যখন দিল্লীর সিংহাসনে, প্রায় সেই সময় জাফর খাঁ ওরফে মুরসিদকুলি খাঁ মুখসুদাবাদে বাংলার নবাবী রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার মুর্শিদাবাদ নাম রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তখন তাঁহার জামাতা রেজা খাঁর রাজস্ব আদায়ের অত্যাচার কাহারও অবিদিত নাই। রাজস্ব না দিলে প্রাণদন্ড, হাজত বা বৈকুন্ঠবাস, নির্ব্বাসন প্রভৃতি ভোগ করিতে হইত। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ কালে এ সময়ে রঘুরাম কৃষ্ণনগরের সিংহাসনে ছিলেন। তাঁহারই সময়ে রামবল্লভ সরকার কৃষ্ণনগরে নিবাস স্থাপন করেন। রঘুরাম রায় ও রামবল্লভ উভয়েই এক গোত্রের ব্রাহ্মণ এবং ভট্টনারায়ণের বংশ; তাঁহাদের মধ্যে সখ্যতাও যথেষ্ট ছিল। এই রামবল্লভ সরকার অশ্বারোহণে যে স্থানটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া দিয়া পছন্দ করেন তাহাই ঘুরণি এবং কলাগাছার জমিদারি হারাইবার পরই তিনি ঐ মনোনীত স্থানের ভূস্বামিত্ব প্রাপ্ত হন। সেই অবধি স্থানটির নাম ঘুরণি হয়। ঐ ঘুরণ কথাটী হইতে ঘুরণি নামের উৎপত্তি এ কথা বলাই বাহুল্য। অনেকেই এই নামোৎপত্তির ইতিহাস জানে না। পরে ইঁহারা ঘুরণির সরকার বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হন।

এবং পরিবর্ত্তনের মধ্যে বংশের প্রাচীন ধারাটি যে ঠিক ভাবে বহিবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা, তত্রাচ কৌলিন্য গুণের অনুশীলন, বেদানুরাগ, অপরিগ্রহ প্রভৃতি নিয়ম পালন তখনও এই বংশে যথারীতি ছিল।

গৌরমোহনের বেদানুরাগ ও পুত্রের উপর প্রভাব।

গৌরমোহন ঋক্‌বেদ পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। সমস্ত দেবদেবীতেও ইঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল। কৃষ্ণনগরে কালীপূজা, শিব প্রতিষ্ঠা, কাশীধামে সপরিবারে শিবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য। তিনি অতিশয় ব্যায়াম পটু, বলশালী ও তেজস্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই সকল গুণই শ্রীশ্রীঠাকুরে দেখা দিয়াছিল। তিনি যখন শিশু তখন হইতেই পূজা পদ্ধতির নানাপ্রকার অনুকরণ করিতেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের আগ্রহ ও উৎসাহের ভাব অতি নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিতেন। সকল সম্প্রদায়ের মেলা উৎসব প্রভৃতি স্বতঃ পরতঃ তাঁহার চিত্তে নানাবিধ ভাবের রেখাপাত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কি এক বিপ্লবের সূত্রপাত করিযাছিল তাহা সাধারণ বিচার বুদ্ধির অগম্য।

বিদ্যাভ্যাস।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বে বেনারসের রাজা চৈতসিংহ সিংহাসনচ্যুত হন। ইহার পর ইংরাজ শাসনের ফলাফলে অন্যত্র যাহা ঘটিয়া থাকে এখানেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জয়নারায়ণ কলেজের বিষয় বেনারস গেজেটীয়রে দেখা যায়। সংস্কৃত কলেজ ও কুইন্‌স কলেজ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার সময়ে তিনটী মাত্র উচ্চ শিক্ষালাভের স্থান ছিল; তিনি কোথায়, কতদূর, কিকি পড়িয়াছিলেন সমস্ত সঠিক জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি কুইন্‌স কলেজে কিছু দিন পড়িয়াছিলেন।

C M S (Church Mission Society) College ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। অন্যান্য স্কুলগুলি সকলই তাঁহার পঠদ্দশার পরে স্থাপিত। ১৮ বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠাভ্যাস কাল নিরূপণ করিলে দেখা যায় নিকটবর্ত্তী জয়নারায়ণ কলেজ ভিন্ন পাঠার্থে তাঁহার অন্যত্র না যাওয়াই সম্ভব। তাঁহার স্বাক্ষরিত একখানি ইংরাজী "Paradise Lost" পুস্তক দেখিয়া জানিয়াছি যে, যে কোন উপায়ে তিনি ইংরাজী ভাষা দখল করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি জুনিয়রসিপ পাশ করিয়াছিলেন কিন্তু একথা ভিত্তিহীন। ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির অস্তিত্বই ছিল না। তবে তখন দেশী পাঠশালায় মৌলবি ও গুরু মহাশয়রা এবং চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতেরা শিক্ষাদান করিতেন। অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মূর্খ ও যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ প্রমাণ করিতে চাহেন, কেহ বা তাহার সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় বা বাংলা জ্ঞান মোটেই ছিল না বলিতে চাহেন। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের ইতিহাস জানিবার জন্য কিছু মাত্র যে চেষ্টা করেন নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

পিতৃনির্দ্দেশে ৺কাশীধামে গরুড়েশ্বর শিবের মন্দিরের সন্নিকটে তেলী বাড়ী নামক একটি স্থানে তিনি ও তাঁহার ভাইপো শশী লাহিড়ী একত্রে পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন। ডেপুটী কালেক্টার কালিকুমার বাবুও তাঁহার সহধ্যায়ী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ অশ্রদ্ধা ছিল না বলিয়াই মনে হয়, কারণ জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকান্ত তখন সাহেবের বাড়ীতে চাকরি করিতেন। পুত্র যাহাতে বাংলা সংস্কৃত প্রভৃতি সকল শিক্ষণীয় বিষয়েই সমভাবে মনোযোগী হয় পিতা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। বিদ্যাসাগরের জন্মকালে বাংলা ভাষার ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার বাংলা ভাষার প্রশংসাই করিবেন কারণ পশ্চিম অঞ্চলে তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষার সবিশেষ সুবিধা ছিল না, তাঁহাকে উর্দ্দু, হিন্দী ও ফারসি প্রভৃতি ভাষাও শিখিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে তাঁহার ও তাঁহার পিতার অনুরাগ থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। নাগভট্ট নামে একজন মহারাষ্ট্রীয়

বেদবিদ পণ্ডিত তাহাকে বেদ, দর্শন প্রভৃতিতে পাঠ দিতেন, তাঁহাকে চতুর্ব্বেদের কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করিতে হইত; তন্মধ্যে ঋক্ বেদ তাঁহার ভালরূপ জানাছিল।

নাগভট্ট একজন মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বেদ বেদান্তে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাকি কাশীতে আর ছিলনা। মনস্বী গৌরমোহনও স্বয়ং বেদচর্চ্চা করিতেন। নাগভট্টের নাসিকা খুব উন্নত ও বক্ষ অতি বিশাল ছিল। বেদব্যাসের লীলাক্ষেত্র ও শিবঠাকুরের বৈঠকখানায় গমন করিয়া গৌর মোহন স্বীয় আভিজাত্যের মর্য্যাদা যে পবিত্র ধর্ম্মচর্চ্চার উপর নির্ভর করে, সে কথা একদিনও বিস্মৃত হন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্বশুর দেবনারায়ণ বাচস্পতিও একজন ধর্ম্মভীরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পশ্চিম অঞ্চলে খ্যাতি পাইয়া ছিলেন। গৌরমোহনের সময় ধর্ম্মচর্চ্চার ঝাঁঝ নষ্ট হয় নাই; পিতৃপুরুষদের সদ্‌গুণের অনুশীলন না থাকিলে আত্মগৌরব নষ্ট হইয়া যায় একথা তখন সকলে বেশ বুঝিত। শ্রীশ্রীঠাকুর কেবল বেদ পাঠ করিয়া নিরস্ত হইতেন না শিক্ষকের সাহায্যে বেদের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া লইতেন।

আজকাল প্রাচীন শাস্ত্রাদির ও সাধনার কথা দূরে থাক পূর্ব্বপুরুষদের নাম ধামও আমরা অনেকে জানিনা বা জানাইনা। কিছুকালপূর্ব্বে প্রতিগৃহে সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধেরা বালক বালিকাদের সাতপুরুষের নাম ধাম গোত্র প্রভৃতি, দেব দেবীর স্তোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শিখাইতেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এসকল ছিল বাল্য শিক্ষা। বয়সের সহিত পিতার আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ বেদপাঠ সমাপনান্তে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ কেদারনাথ দর্শন করিতে যাইতেন ও তথাকার ঘাটে পতিতপাবনী, কুলকুলনাদিনী, মৃদু প্রবাহিনী ভাগীরথীর তীরে বসিয়া একান্তমনে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিতেন। কাশীতে এখনও এইরূপ অনেকে করিয়া থাকেন। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে স্বতঃ আধ্যাত্মিকভাব ফুটিয়া উঠে তাই সংহিতাকার মনুও নির্জ্জন নদীতীরাদিতে সন্ধ্যাবন্দনাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বাল্যাভ্যাস

অনেকের বিদ্যালয়ে যাইতে বিলম্ব ঘটিত, তিনি কিন্তু সামান্য ঘি ও নুণ দিয়া ভাত খাইয়া ঠিক সময়মত স্কুলে যাইতেন, বৈকালবেলায় স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পড়িবার টেবিলের কাছে চেয়ারে পা ঝুলাইয়া কতক সময় বসিয়া থাকিতেন। বৈকালে সামান্য গুড় ও ছোলা মাত্র জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। তাহাও সময়মত কেহ দিয়া যাইলে বা পূর্ব্ব হইতে রাখিয়া দিলে খাইতেন, ভুল হইলে বা না দিয়া যাইলে কখনও চাহিয়া খাইতেন না। এক ঘন্টার মধ্যে জলখাবার আসিয়া জুটিলে খাওয়া হইত নচেৎ কেদারনাথের মন্দির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িতেন। চাহিয়া খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিলনা। এমন কি তরকারিতে লবণ অল্প হইলেও বলিতেন না যে লবণ দাও। পরে ভুল হইয়াছে বলিয়া কেহ লজ্জা প্রকাশ করিলে বলিতেন, ''একদিন ভুল হলই বা, তাতে কি হয়েছে।'' কাপড় ছিঁড়িয়া যাইলে ছেঁড়াকাপড় পরিয়াই অনেক দিন চালাইতেন, কখনও এ চাই ও চাই বলিয়া জ্বালাতন করা, এমন কি চাওয়াই তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ কেহ যদি নিজ বিবেচনায় ব্যবস্থা করিলেন ত ভালই নচেৎ তিনি স্বয়ং আহার বা পরিচ্ছদবিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই সকল সামান্য সামান্য ব্যবহারের পশ্চাতে তাঁহার মনের যে কিরূপ গতি তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সঙ্গীদের মধ্যে সন্তরণক্রীড়া প্রভৃতিতে তিনি অগ্রণী ছিলেন; তাঁহার শরীরের বলও যথেষ্ট ছিল এবং তিনি শ্রমসহিষ্ণু ও ব্যায়ামপটু ছিলেন। তিনি সঙ্গীদের সহিত বৃথা আলাপ করিতেন না, অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে গাম্ভীর্য ঔদার্য্যের লক্ষণ ছিল। সমস্ত কার্যই ঠিক ভাবে হুঁসিয়ার হইয়া করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সকল দিকেই সমভাবে প্রযুক্ত হইত। ছোট ছোট ছেলেদের ও সমবয়স্কদের মধ্যে তিনি দলপতি ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে মানিয়া চলিত। তিনি কোন কুকার্য্যে যোগদান করিতেন না; সকলকে ভাল কার্যের দিকে টানিতেন। জলে লাফাইয়া পড়ায় তাঁহার খুব সাহস ছিল। গৌরাঙ্গ ঘাট ওরফে গোড়েন ঘাট হইতে কেদার ঘাট ও কেদার

ঘাট হইতে গোড়েন ঘাট পর্য্যন্ত বর্ষার টানে সাঁতার দেওয়া বেশ শক্ত কিন্তু তিনি তাহাও ছাড়িতেন না। বাল্যকালের আর অধিক কিছু জানা যায় না।

বিবাহ

শালিখার শ্রীশ্রীদেবনারায়ণ সান্যাল (বাচস্পতি) মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত ১৮৪৫—৪৬ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষীয় শ্রীমান্ শ্যামাচরণের শুভপরিণয় হয়। বিবাহের পর নাকি শ্রীশ্রীঠাকুর একবার গোয়াড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় যদুনাথ পাল প্রভৃতি অনেকের সহিত নাকি তাঁহার গোয়াড়ীতে আলাপ পরিচয় হয়। কৃষ্ণনগর ও কাশীর সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন। কৃষ্ণনগর বিশেষতঃ কাশীধাম নানা সম্প্রদায়ের লীলাক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুত্রদ্বারা বেদ ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হউক ইহাই গৌরমোহনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল; দেবতারাও দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া তথাস্তু বলিয়াছিলেন। সেই শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, স্বর্ণকান্তি, প্রীতির মূর্ত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন ছিল। যে কেহ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে সেই তাঁহার উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা অবগত হইয়া চমৎকৃত হইয়াছে। সত্যসত্যই "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যতে সর্ব্ব সংশয়াঃ"এ এক অবস্থা আছে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলেই ইহা বুঝিতেন। একত্রিত বহু সম্প্রদায়ের লোকের সহিত একই বিষয়ের বিচারকালে সকলেই তাঁহাকে স্বকীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিত, তাঁহার বিচারের যুক্তি শুনিয়া সকলেই নিজের সাম্প্রদায়িক মতই প্রতিষ্ঠিত হইল এইরূপ ধারণা করিয়া ফেলিত। বস্তুতঃ তিনি উপলব্ধির সহিত সমস্ত শাস্ত্রের মিলনটুকু লক্ষ্য করিয়া কেবল সত্যার্থের উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন।

তৎপুত্রদ্বয়।

১৮৬৩ খৃঃ অঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রী তিনকড়ি লাহিড়ী ও ১৮৬৫ খৃঃ অঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীদুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় (মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব) কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীদুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় ১৯২১ খৃঃ অঃ ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্র বারটার সময় বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে ভবধামত্যাগ করিয়া অমর ধামে গমন করেন। ইহার পূর্ব্ববৎসর ২৯শে জানুয়ারি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পূজনীয়া মাতৃদেবীও আমাদের ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যশীলা পত্নী এখনও বর্ত্তমান। ইঁহার বয়স ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একানব্বই বৎসর মাত্র। এখনও ইনি নিয়মিত পূজাপাঠ করিয়া থাকেন এবং ইঁহার মস্তিষ্কের কোন বিশেষ বিকার লক্ষিত হয় না।

২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয় এবং পিতৃ বিয়োগের পূর্ব্বে আনুমানিক ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রমকালে (১৮৫১ খৃঃ অঃ) তিনি গাজিপুরে সরকারি চাকরি আরম্ভ করেন। মির্জাপুর, বক্সর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, রাণীখেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি পূর্ত্তবিভাগে (Public work department, military engineering works) এ তিনি কাজ করিতেন। সৈন্য সামন্তদের রসদ দেওয়া এবং রাস্তাঘাট তৈয়ার করা তখন ইংরাজদের এই সামরিক বিভাগের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। এই জন্য তখন রাজকীয় পূর্ত্তকর্ম্ম বিশারদ (Royal Engineer) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় ক্লার্কের কাজ করিবার জন্য বদলি হইয়াছিলেন। অন্য অফিসে পরে সকলে তাঁহাকে ব্যারাক্ মাষ্টার বলিয়া ডাকিত। ঐ অফিসের নাম আজকাল D.D.M.W. Office হইয়াছে (Deputy director of military work's office এবং ব্যারাক্ মাষ্টারের নাম S.D.O. হইয়াছে অর্থাৎ সবডিভিসনাল অফিসার। তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাষ্টার

(আজকাল যাহাকে ঐ বিভাগের S.D.O বলে তাহাই) হইয়াছিলেন। সামরিক বিভাগের উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ সাহায্যে বিবিধ অফিসে অনুসন্ধানের ফলে এ সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল পত্রাদি প্রকাশিত হইল না।

দীক্ষাস্থান ও কালনির্ণয়।

কত বয়সে তিনি দীক্ষা পাইলেন এবং কতদিনে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং সকলের পক্ষে তাহা খাটিতে পারে কি না এ বিষয়ে অনেকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। দীক্ষা লাভের পর তাঁহার দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় এবং তিনি তাহার পর কঠিন পরিশ্রম করিয়া চাকরিও করিয়াছিলেন কিন্তু সকল কর্ম্মেই তাঁহার অদ্ভূত নির্লিপ্তভাব দেখা যাইত। দানাপুর হইতে একটি তাড়িতবার্ত্তা (টেলিগ্রাফ) অনুসারে অনুমান ভাদ্রমাসে সরকারি কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার চাকরি বদলি হইয়া যায় এবং উত্তর সীমান্ত প্রদেশে নৈনিতাল পাহাড়ের উত্তরে রাণীখেত নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে তিনি প্রেরিত হন। সেখানে যাইতে অবশ্য সারা ভাদ্রমাস লাগিয়া থাকিবে। ঐ স্থান প্রায় ছয় হাজার ফুটের উপর উচ্চ ও সকল সময়ে শীত প্রধান, সম্মুখে মনোহর বরফের পাহাড় আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। হিমালয়ের হিমময় তুষারশুভ্র চূড়াগুলি দেখিলে অনভিজ্ঞের মনে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। সে কি প্রাণকাড়া দৃশ্য! চারিদিকে হিমালয়ের শৃঙ্গ সকল যেন আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া লক্ষ্যশূন্যের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। যেদিকে তাকাও চারিদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়, একটীর গায়ে আর একটী যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে, উপরে আকাশেও পাহাড় মাথা তুলিয়াছে, মানুষের মনের সকল চিন্তাকে গ্রাস করে ফেলে সে দৃশ্য, তখন মন যে কি এক অনির্ব্বচনীয় অসীমের মহিমায় ডুবিয়া যায় তাহা অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্যের ভাবুকতায় প্রকাশ হইতে পারে না। কত সহস্র পাহাড় ভাঙ্গিয়া তবে ঐ স্থানে যাওয়া যায় রাণীখেতে লোকজন ও পাহারা লইয়া ঠাণ্ডায় তাঁবু খাটাইয়া তাঁহাকে থাকিতে হয়। এই স্থানে তাঁহার

বেশীদিন থাকা ঘটে নাই। কয়েকদিন পরেই আবার তাড়িৎ [illegible] যোগে তাহাকে দানাপুরে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করা হয়। বো[illegible] সাহেব অন্য এক জনের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ খানে পাঠাইয়া বসিয়াছিলেন। এই রাণীখেতে থাকিবার সময় তিনি দীক্ষা লাভ করেন। এখন মোটরলরিতে চারি পাঁচ টাকা খরচ করিলে কাঠগোদাম হইতে ঐ স্থানে ছয় সাত ঘন্টায় অনায়াসে যাওয়া যায়। কিন্তু তখন গরুরগাড়ি ভিন্ন ঐ স্থানে তাঁবু লইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। অবশ্য দার্জ্জিলিঙ্গের ন্যায় সেই বাঁকা বাঁকা গড়ান পথের দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

দীক্ষার কাল।

যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট দীক্ষাকালাদি নির্ণয জন্য ব্যাকুল হইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম সেই সময় দৈব বশতঃ শ্রীমৎ পরমহংস প্রণবানন্দ স্বামী রাঁচীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং হৃষিকেশ যাইয়া দেহ রক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যকীয় কয়েকটী ঘটনার কথা বলিয়া দিয়া যান। এইরূপ কয়েকটী ঘটনা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে জীবনী লেখার ভার প্রকৃতই এই অধমের উপর ন্যস্ত আছে।

দানাপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত বর্দ্ধমানের নিকটস্থ সাতগাছির পলাতক বালক নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শ্রীমৎ পরমহংস প্রণবানন্দ স্বামীর) সাক্ষাৎ হয়। ঐ বালক তখন অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ও চঞ্চল স্বভাব, উহাঁর বয়স মাত্র তের, দানাপুর ষ্টেশনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কেবল ঘুরিয়া বেড়ান, এমন সময় ষ্টেশনেই তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ হইল। ছোট ছেলেকে একাকী উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক করিয়া প্লাটফরমে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে কৌতুহলবশতঃ নিকটে ডাকিলেন। অন্যান্য ঘটনা এ স্থানে আলোচ্য নহে।

যাহা হউক প্রণবানন্দ স্বামীকে তাঁহার দীক্ষাকাল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন দানাপুর হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত যে বৎসর রেল লাইন খুলে তাহার এক বৎসর পূর্বে দানাপুর হইতে বদলি হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রাণীখেতে দীক্ষালাভ করেন ও অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসেন এবং যে বৎসর রেল খুলিল সেই বৎসর প্রণবানন্দ স্বামীর রেলে চাপিবার খেয়াল চাপে এবং সেই বৎসরই তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরমহংসদেবের এই উক্তি দীক্ষাকাল নির্ণয় করিয়া দেয়। প্রণবানন্দ স্বামীর বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স ৩৪ বৎসর সুতরাং ইহাই তাঁহার দীক্ষাকাল নির্ণয়ের অতি সুন্দর প্রমাণ।

দীক্ষাকাল ৩৩ বৎসর ১৮৬১ খৃঃ অঃ

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত প্রথম কোম্পানির রেল লাইন খুলে। ইহাই প্রণবানন্দ স্বামীর দীক্ষার বৎসর এবং ইহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণীখেতে যাইয়া দীক্ষালাভ করেন। অন্যান্য প্রমাণ এই প্রমাণের সমর্থন করিয়া থাকে। যখন তিনি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন তাহার পূর্ব্বে তাঁহার "চাকরে" জীবনের দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ খৃঃ অঃ ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি সৎগুরু লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি দানাপুরে Assistant Commanding Royal Engineering Office এ এই সময়ে ২য় ক্লার্কের কাজ করিতেন। একদিন ভাদ্রমাসের প্রথমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিকট একটী টেলিগ্রাফ আসিল যে নৈনিতালের উত্তরে হিমালয়, রাণীখেতে তাঁহাকে বদলি হইয়া যাইতে হইবে, তাঁহাকে কিরূপভাবে কোন তারিখে কোন কোন পথে যাইতে হইবে পথঘাট প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহাকে জানান হইয়াছিল এবং কোম্পানী হইতে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। দানাপুর হইতে তাঁহার গন্তব্যস্থান পাঁচশত মাইল দূরে। পূর্ব্বে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছিল এবং পথের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাম

করা হইয়াছিল।

টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি রাণীখেতে যাত্রা করিলেন। পথে বিশ্রামের স্থান প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে জানান হইয়াছিল। অধিকাংশ রাস্তাই তিনি এক্কায় গিয়াছিলেন। একমাসের মধ্যে ভাদ্রমাসের শেষাশেষি তিনি রাণীখেতে পঁহুছেন। রাণীখেত অঞ্চলে টেলিগ্রাফের খোঁটা বসান, রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করা বা মেরামতি করা এই সব কায তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল।

এই সব কায আজকাল D. D. M W. র অধীন। ১৮৪৮ খৃঃ অঃ হইতে লর্ড ডালহাউসির চেষ্টায় ভারতবর্ষের পূর্ত্তবিভাগের কার্য্য একটী প্রধান অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণীখেতে পঁহুছিয়া লোকজন সিপাহি লইয়া তাম্বু খাটাইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে নিজের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখনও তাঁহাকে কি করিতে হইবে না হইবে তাহার কোন নির্দ্দেশ ছিলনা। তিনি ক্লার্কের কাজ করিতেন সুতরাং কোন কালেই তাঁহার টাকাকড়ির সহিত সম্পর্ক ছিল না এবং পাহাড়িয়াদের নিকট হইতে তাঁহার কোন ভয়েরও কারণ ছিল না। কাযের মধ্যে তখন দু একটি টেলিগ্রাফ বা পত্রের উত্তর দেওয়া, তাও সকল দিন পত্র আসিত না। ঐ স্থানে যাইলে স্বভাবতঃই পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয়। তখন মনে হয়, "ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব, শিখর হইতে শিখরে ছুটিব।" বিশেষতঃ কোন কাজকর্ম্ম না থাকিলে লোকে আর ঐ স্থানে কি করে?

অদূরে উত্তরে হিমালয়। প্রথমেই কতকগুলি পর্ব্বতমালার পর দূরে দ্বারাহাট পাহাড় নয়ন গোচর হয়। ঐ সকল পাহাড়ের বুক চিরিয়া গগাস নদী প্রবাহিতা। দ্বারাহাট পাহাড় সমুদ্রের একটী অতি উচ্চ ঢেউয়ের মত উঠিয়া যেন আর পড়িতে চাহিতেছে না, তাহার উপরেই আরও উচ্চ আর একটী পাহাড়ের ঢেউ উকি মারিতেছে,

উহাকে দ্রোণগিরি বা চলতি কথায় ধুনাগিরি বলে এবং তাহার পরেই রজতশুভ্র বরফের পাহাড়ের অভ্রভেদী আর একটী ঢেউ; উহাই নগরাজ চিরপূজ্য হিমালয়। রাণীখেত হইতে দেখিলে মনে হয় দ্রোণগিরি পার হইলেই হিমালয়ের বরফের মধ্যে পড়িব। রাণীখেত ও দ্রোণগিরির ব্যবধান মাত্র পনের মাইল। স্বভাবতঃই তাঁহার মন ঐ দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। একদিন ভ্রমণস্পৃহা বলবতী হইল। স্থানীয় পাহাড়ী লোকদের একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে কোন সাধু পুরুষ বা সন্ন্যাসী পাহাড়ে বা জঙ্গলে থাকেন এমন কাহারও কথা তাহারা জানে কি না?" ফলে জনৈক সাধুর সম্বন্ধে তিনি অনেক অদ্ভুত কথা শুনিলেন।

গুরুদর্শনে।

শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে পূজা ও আহারাদি করিয়া দূরের পাহাড় ও সাধু দেখিতে যাইবেন ঠিক করিলেন, যেন সেই দিনই ফিরিতে পারিবেন আশা করিয়াছিলেন। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র সেই বিজন প্রদেশে তিনি একাকী চীরগাছে ঢাকা এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন; অনেক দূর উঠিয়া শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অবসন্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, এখনও অনেক উঠিতে হইবে, সাধু এখন দর্শন নাও দিতে পারেন, সাধু নাও থাকিতে পারেন, ফিরিতে রাত্রি হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এইরূপে মনের মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। এমন সময়ে পাহাড়ের গায়ে এক সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। ঐ সাধু শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। পরের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তিনি একটু ভয় পাইলেন। সাধু তাঁহাকে নানা প্রবোধ দিলেও তিনি ভয় গোপন রাখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই পাহাড়ের প্রধান সাধু? উপরে কোন বড় সাধু আছেন কিনা এবং এখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে কিনা?" উত্তর হইল, "উপরে গুহাতে এক বড় সাধু থাকেন,

আপনার যে সাধুর দরকার আমি সে সাধু নই আমি তাঁহার আশ্রিত প্রায় সন্ধ্যার পর গুহা হইতে সাধু বাহিরে আসেন এবং সেই সময় দেখা হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া ঠিক করিলেন যখন এতদূর এসেছেন গুহা দেখিয়াই দিন থাকিতে ফিরিবেন, অন্য দিন সিপাহিদের সাহায্যে তাঁবু প্রভৃতি লইয়া তোড জোড করিয়া রাত্রে থাকিবেন সুতরাং তখন তিনি একটু দ্রুত চলিতে লাগিলেন। তখন ভাদ্রের শেযে পাহাড়ে শীতের সময সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোহর হইলেও তাঁহার আর সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। দ্রুতপদে যাইযা পাহাড়ে উঠিয়া তিনি একটী গুহা পাইলেন। গুহার মধ্যে সাধুর পূজার ব্যাঘাত হইবে এই শঙ্কায় তিনি তাহার ভিতরে না ঢুকিয়া নিকটে বাহিরে বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন বিশ্রামের পর ফিরিবেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সাধু সেদিন সকাল সকাল গুহার বাহিরে আসিলেন এবং লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্যামাচরণ তুম্ আগযা"। তিনি পূর্ব্বেই সাধুর নিকট নিজের নাম শুনিয়া একবার ভীত হইয়াছিলেন, আবার এই সম্ভাষণ, সুতরাং তিনি বিশেষ তুষ্ট ত হইলেন না বরং তাঁহার মনে নানা সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল এবং তিনি সাধুর উদ্দেশ্যে একটা শুষ্ক প্রণাম করিলেন; আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এদের একটা দুষ্টামির দল আছে, নিশ্চয়ই ইহাদের কেহ আমার পাহারাদার বা চাকরদের নিকট হইতে আমার নাম ধাম প্রভৃতি সমস্ত সন্ধান লইয়াছে তাই এখন আমার নাম বলিয়া দিয়া মন ভুলাইয়া পরে ঠকাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাধু তখনই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয় প্রভৃতি দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপুরুষদের নাম ত সিপাহিরা জানে না সুতরাং শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন এ লোকটা নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় বুজরুক। ঠিক তাহার পরেই সাধু তাঁহার মনের চিন্তার উত্তর দিয়া দিলেন, "শ্যামাচরণ, তুমি বড় ভুল বুঝিতেছ, আমি বুজরুক নহি। তোমার মনে পড়ে কি তুমি আর কখন এখানে এসেছিলে কিনা।" এইবার তিনি প্রমাদ গণিলেন, মনে ভাবিলেন, এই লোকটি আমার মনের ভাব টের পাইয়াছে। যাহা হউক সাধুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, বলিলেন, "আমি এ পাহাড়ে এই

প্রথম আসিলাম, এর আগে আমি আর কখনও আসি নাই'' অবশ্য কথাবার্ত্তাটা হিন্দিতেই হইয়াছিল। সাধু বারংবার শ্রীশ্রীকাশীর ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, ''ভাবিয়া দেখ ইহার পূর্ব্বে তুমি আর কখনও এখানে আসিয়া ছিলে কিনা এবং এই সকল স্থান তুমি চিনিতে পারিতেছ কিনা?'' বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি, ''না'', ''না'' করিয়া গেলেন এবং এইরূপ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেই প্রধান সাধু (বাবাজী) তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পরিত্যক্ত দন্ড, কমন্ডলু, বাঘছাল, ধুনী প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, ''এগুলিও তুমি চিনিতেছ না — এগুলি বহুকাল এই একই স্থানে একই ভাবে পড়িয়া আছে।''* তখনও তিনি বলিলেন, ''আমি কিছু বুঝিলাম না।'' তখন সেই সাধু ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

---

* এই কথোপকথন হইতে মনে হয় পূর্ব্বজন্মে অন্ততঃ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ গুহায় সন্ন্যাসীরূপে তপস্যা করিতেন এবং ৩৩ বৎসর ধরিয়া দন্ড কমন্ডলু ছাল প্রভৃতি ঐ গুহাতে পড়িয়া ছিল, কেহ তাহা স্পর্শও করে নাই বা বিশেষ স্থানান্তরিত করে নাই। দন্ডকমন্ডলু প্রভৃতি বিষয়ে শেষোক্ত কথাগুলি একজনমাত্র লোকের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ লিখিলাম। এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ বৃথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই প্রকার ভক্ত আছেন। একদল গৃহী এবং অপর দল সন্ন্যাসী। এই দুই দলের লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুদেবকে নিজ নিজ মনোমত রং দিয়া সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গৃহীর দল বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ হইতে শুনিয়াছেন যে তাঁহার গুরুদেব সাদাকাপড় পরিতেন এবং তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও চিরকুমার ছিলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারাশ্রমী না হইলে কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। নানা অনুসন্ধান ও বিচার দ্বারা এই মাত্র ধারণা হয় যে শ্রীশ্রীঠাকুরের গুরুদেবের বেশভূষা সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ ও আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। গৈরিক বা সাদা দুইরকম কাপড়ই পরিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বজন্মে স্বয়ং যে সন্ন্যাসী ছিলেন এ কথা অনেকেই তাঁহার নিকট শুনিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে আজীবন সন্ন্যাসী ছিলেন কিনা এরূপ নির্দ্দিষ্ট ভাবে কেহ কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। তিনি প্রণবানন্দ প্রভৃতি অনেককেই বাল্যে দীক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহারা অবিবাহিত ছিলেন। প্রণবানন্দ এই নামটীও তিনিই পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে [illegible] জাতির পক্ষে স্বাভাবিক গৃহস্থাশ্রম

শ্রীশ্রীকাশীর ঠাকুর সেই স্পর্শে সমস্ত শরীরে এক প্রকার তড়িৎ সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলেন এবং গুহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানটি পূর্ব্বস্মৃত অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সাধুও গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই কমন্ডলু, এই বাঘছাল, এ সমস্তই তোমার। তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার চেলা ছিলে এবং কর্ম্মের গতিতে এইখানে দেহ ছাড়িয়া আবার নূতন দেহ লইয়া এখানে আসিয়াছ। আমিই তোমাকে এখানে কৌশলে আনিয়াছি। প্রায় সমস্ত বড় বড সাধু এই প্রদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আমি কেবল গচ্ছিত ধনের রক্ষকের মত তোমাকে দীক্ষা দিবার অপেক্ষায় এই স্থানে রহিয়াছি এবং আরও দুই একজন মাত্র এখনও আছেন। আমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর সেই অদ্ভুত স্পর্শে বুঝিলেন যে তিনি পূর্ব্বজন্মে সেই সাধুরই একজন চেলা ছিলেন এবং তিনি যে একজন সন্ন্যাসী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতেন এ ব্যাপার যেন এ জীবনের ঘটনার ন্যায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বর্ত্তমান জীবন ও পূর্ব্বজন্মের জীবন এই দুইয়ের মধ্যে যে বিস্মৃতি ছিল তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুচিয়া গেল। তখন সমস্ত ঘটনাই এই এক জীবনের ঘটনা বলিয়া মনে পড়িল। এইবার শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বদেবময় জ্ঞানে পুনরায় ভক্তির সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এইবার আর সেই সাধুকে সাধুবেশধারী চোর-ডাকাত মনে করিয়া কোন সন্দেহ হইল না, কাজেই তাঁহার মন শ্রীশ্রীগুরুদেবের পদে আপনা হইতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।**

যে শ্রেষ্ঠ একথা তিনি স্বীকার করিতেন। জন্মকাল হইতে যাহারা সংসারবন্ধনে বিরক্ত এবং সমাধিনিষ্ঠ তাহারা সন্ন্যাস নিলেই বা কি আর না নিলেই বা কি। অনেক চিরকুমার সাধক তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার পর আত্মগোপন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনায় নিমগ্ন আছেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ঘৃণা করিতেন ও আন্তরিক অনুষ্ঠান পছন্দ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কি কবীর? অদ্ভুত মত !

** শ্রীশ্রীকাশীর ঠাকুরের গুরুদেবকে আমরা [illegible] বলিয়া জানি। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা জানি যে তাঁহার গুরুদেবকে ত্র্যম্বক বাবা বা শিব বাবা বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নিকট পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু

বৈরাগ্য ও উপদেশ। সনাতন ও বৈদিক সাধনপথ

এইবার সাধু বলিলেন, "তোমার প্রতি যে টেলিগ্রামে এখানে আসিবার আদেশ ছিল তাহা সাহেবের একজনকে পাঠানোর ভ্রান্তি মাত্র এবং তোমাকে এখানে আনিবার জন্য সেই ভ্রান্তি আমিই ঘটাইয়া ছিলাম। আবার সাত দিন পরে তোমার প্রতি ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইবে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "আপনি অনুমতি করুন যেন আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে পাই। আর আমার সংসারে ফিরিতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছে না। আমি হারানো জিনিষ পেয়েছি, আর হারাইতে চাই না। তখন সাধু অনিচ্ছা জানাইয়া বলিলেন, "তা হবে না তোমাকে এখন প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে, এখনও তোমার সংসার কর্ম্ম বাকি আছে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিলে ভাল শুনায় না বলিযা তাঁহাকে সংক্ষেপে সকলেই বাবাজী বা বাপ্‌জী বলিযা সম্বোধন কবিত। অনেকে তাঁহাকে পাঞ্জাবী সাধু বলেন। শুনা যায ইনিই সাধু হরিদাসের ও গুরু।

অবিকল কাশীর ঠাকুরেরই মত তাঁহার গুরুদেব ত্র্যম্বক বাবা বা বাবাজীর চেহারা ছিল। ঠিক ঐ রকম মুখ, ঐ রকম রং, প্রায সবই ঐ রকম। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে অর্থাৎ বাবাজীকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারাও লাহিড়ী মহাশযের সহিত তাঁহার চেহারার সাদৃশ্যের কথা সমর্থন করেন। শুনা যায় কাশীর ঠাকুরের গুরুদেবের বয়স প্রায় পাঁচশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। যোগবলে তিনি স্থিরযৌবনমূর্ত্তি রক্ষা করিতেন। কি করিয়া ইহা সম্ভব তাহা স্থানান্তরে দেখান হইবে।

অনেকে বুঝিবার দোষে তাঁহাকে কবীর বলিয়া প্রমাণিত করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অনেকে একথাও বলেছেন যে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) পানসিউলির মোহন্তর আস্থান হইতে তিনি কবীরের যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ছাপাইতে দিয়াছিলেন তাহাতে নাকি কবীর নিজে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি পুনরায় শ্যামাচরণ সরকাররূপে [illegible] করিবেন। তিনি নিজে ঐ কথাটি যে

তবে তুমি যে কদিন এখানে থাকিবে প্রত্যহ এখানে আসিবে। তুমি এখানে অফিসের জন্য আস নাই, অফিসই তোমার জন্য আসিযাছে।'' বাবাজী লাহিড়ী মহাশযকে আরও বুঝাইয়া দেন যে তাঁহার মধ্যে বংশানুক্রমে যোগাভ্যাসের বীজ নিহিত

পৃষ্ঠাতে লেখা ছিল পাছে ঐ সংবাদ প্রচারিত হইযা পড়ে এই জন্য সেটা দুই একজনকে দেখাইযা ছিঁড়িযা ফেলিযাছিলেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশযও তাঁহাকে কবীব বলিতেন। বাস্তবিক মানুষের মাথায যখন একটা ধারণা দাঁড়াইযা যায তখন সমর্থন কবিবার যুক্তির অভাব হয না, কল্পনাদেবীর কৃপায অনেক প্রমাণও কল্পিত হয। এইরূপ ধাবণা যে কতদূর সারগর্ভ তাহা নিম্নের বিচার হইতে জানা যাইবে।

১। কবীর যদি নিজে পুস্তকে লিখিয়া শ্যামাচরণ সরকার বলিযা নিজেকে প্রচার করিযা ছিলেন তবে তাহা তাঁহার ছিঁড়িবার কোন হেতু থাকা উচিত নহে।

২। শ্রীশ্রীঠাকুর ''আমি কবীর'' একথা অনেকের নিকট কবীর পাঠকালে বলিযাছেন এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। কিন্তু 'আমি কবীর এই কথায 'আমি পূর্ব্বজন্মে কবীর ছিলাম' এ মানে হয না। কারণ তিনি পূর্ব্বজন্মের গুরুর নিকট দীক্ষা পাইযাছেন এই কথাটা বজায রাখিলে অনেক তর্ক উঠে। এই কথা যদি সত্য হয তবে বাবাজী কবীরেরও গুরু স্বয়ং রামানন্দ ভিন্ন আর কেহই নন।অথবা কবিরের প্রকৃত গুরু ত্র্যম্বক বাবাই ছিলেন। অবশ্য এ যুক্তি কাহারও মাথায় না আসিলেও দেখান যাইতে পারে যে কবীর ও তাঁহার গুরু রামানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। এই হিসাবে বাবাজীর বয়সও পাঁচশত বৎসর হওয়া বিচিত্র নহে। যোগিরাজ কবীরের দেহান্ত ঘটিলে তাঁহার দেহের সৎকারের অধিকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইলে, দৈববাণী হয় যে ''শবাবৃত বস্ত্রের নিম্নে যাহা আছে তাহা ভাগ করিয়া লইয়া যাহার যাহা অভিরুচি কর।'' তদনুসারে বস্ত্রখন্ড উত্তোলন করিয়া শবের পরিবর্ত্তে কেবল কতকগুলি পুষ্প পাওয়া গিয়াছিল। যে কোন স্কুল পাঠ্য ইতিহাসেও উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। তবে সম্ভবতঃ কবীর যোগবলে অন্তর্হিত হইয়া লোকালয়ের বাহিরে সন্ন্যাসী হইয়া তপস্যা করিয়া জীবন কাটাইতে ছিলেন। আবার কোন কর্ম্ম ফলে হয়ত এতদিন পরে তাঁহাকে সংসারী হইয়া কর্ম্মের খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহাতে কবীরের পুনরাবির্ভাব আরোপ করিতেই চাহেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য তিনটা কথা বলিতে পারি। প্রথম, তিনি নিজেকে কবীর বলিয়াছেন, দ্বিতীয়, তাঁহারও গুরুর বয়স পাঁচ

ছিল ও আছে। তাহার পর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভাবে বলিলেন, "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে ঽব্রবীৎ।। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ। সএবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।" (৪র্থ অঃ ১,২,৩ শ্লোক)। এইরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে লুপ্ত প্রায় যোগসাধনকে প্রচার করিয়াছিলেন গীতায় বলে, সেই যোগ পুনঃ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে ইহা বাবাজী বুঝাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন

শত বৎসর; তৃতীয়, রামানন্দ ও কবীরকে কেহই নশ্বর জীবের ন্যায় দেহ রক্ষা করিতে দেখেন নাই, তাঁহারা পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বের গুপ্ত সাধক এবং উভয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ, পরম ভাগবত ও যোগী। সত্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই যুক্তি অপর কেহ না দিলেও আমাদিগকে বিচারের জন্য ধরিতে হইতেছে।

কিন্তু আমাদের মনে হয় একথা ঠিক নহে। ইহার বিপক্ষে যুক্তি আছে, সুতরাং তিনি কবীর, তিনি কবীর জন্মে সন্ন্যাসীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ও পতিত হইয়াছিলেন এবং পুনর্জ্জন্মে তিনিই তাঁহার গুরু ত্র্যম্বক বাবাকে পাইয়াছিলেন বা ত্র্যম্বক বাবাই রামানন্দ, এতগুলি কল্পনা ত্যাগ করা যায় কিনা দেখা উচিত। কবীরের পুত্রকে "শ্যামাচরণ সরকার" এই নাম ছিল ইহাও বোধ হয় কল্পনা দেবীর দান। এই সকল কল্পনার বিপক্ষে যুক্তিটী এই। যাঁহারাই একটু প্রণিধান করিয়া শুনিয়াছেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তিনি ব্যাখ্যা কালে অনেকের সহিত নিজের একত্ব, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য বা সালোক্য আরোপিত করিতেন। এমন কি যখন কোন কিছু ব্যাখ্যা কালে শিবোঽহং প্রভৃতি বলিয়াছেন তখন তাঁহার শিষ্যদিগের অনেকে প্রকটিত হইতে দেখিয়াছেন বলেন। ইহা কেবল ভাবার কথা নহে, ইহা অবস্থার কথা। এইরূপ "আমি কবীর" কেন অন্য অনেক কিছুই যে তিনি তাহা তিনিই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিব্য মহাপুরুষদের আকর্ষণ করিয়া তন্ময় হইতে পারিতেন। ইহাকে সারূপ্য বলে। আর বাবাজী যে রামানন্দ একথা তিনি কাহাকেও বলিয়াছেন বলিয়া এ যাবৎ শুনি নাই। আমরা বাবাজীকে ত্র্যম্বক বাবা, শিববাবা, বা ত্র্যম্বক স্বামী বলিতেই শুনিয়াছি। তিনিই যদি কবীর ভিন্ন অন্য কোন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক ও ধর্ম্মপ্রচার জন্য সহকারী হইয়া [illegible] দুঃখ কি?

বাবাজী লাহিড়ী মহাশয়কে সেই দীক্ষাই প্রদান করিযাছিলেন। বাবাজী আবার লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন, "তোমাদেরই এ জিনিষ"।***

দীক্ষার পূর্ব্বদিন জোলাপের ব্যবস্থা।

তাহার পরদিন শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রমের নিকট অফিসের কায কর্ম্ম দেখিবার জন্য তিনি অন্য একটি তাঁবু ফেলিলেন, সিপাহিরা পত্র প্রভৃতি লইয়া সেই তাঁবুতে উপস্থিত হইত এবং তিনিও আহারাদির পর কিছুক্ষণ তাঁবুতে থাকিয়া দুই একটা চিঠি পত্রের জবাব দিয়া দিতেন এবং চাকরদের কাহাকেও পত্রাদি আসিলে সেই সকল যত্ন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রমে চলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে নিয়মিত ভাবে সৎগুরু সঙ্গ করিতেন এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশমত প্রস্তুত ও রক্ষিত আহার গ্রহণ করিতেন। একদিন একটা ছোট গামলায় অনেকটা রেড়ীর তেল রাখা ছিল।

যোগশিক্ষা কি সাম্প্রদায়িক?

***বলাবাহুল্য ইঁহাদের বংশপরিচয়স্থলে দেখা যায় যে ইঁহাদের মধ্যে বংশানুক্রমে যোগের ধারাই চলিয়া আসিতেছে। শাণ্ডিল্য মুনির ভক্তি সূত্র ও শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ অতি সুন্দর উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ। শাণ্ডিল্য উপনিষদে যে সকল যোগের উপদেশ আছে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল দেশে সকল সময়ে চরিত্রগঠনের উপযোগী এরূপ শিক্ষা অত্যন্ত আদরণীয়। ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। রসায়ন শাস্ত্রকে (Chemistry) কি সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বলা চলে? পদার্থবিদ্যাকে (Physics) সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বলা চলে কি? সে বিষয়েও গুরু, শিক্ষালয় ও দক্ষিণাদির ব্যবস্থা আছে। সেইরূপ যোগাভ্যাসকেও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বলা চলে কি?

সেইরূপ যোগশাস্ত্রকেও সাম্প্রদায়িক শিক্ষা বলা চলে না। পাঁচটা বিজ্ঞানের বিষয় পাঠ করিয়া যেমন শিক্ষার পূর্ণতার সুবিধা হয় তেমনি যোগশাস্ত্রও সেইরূপ। অধিকন্তু তিনি কুলগুরুর নিকট শিষ্য লইবার পর যোগশিক্ষা দিতেন। উপনিষদের যুগে বা বৈদিক যুগে [illegible] [illegible] প্রাচীন যোগ [illegible] এই শাণ্ডিল্য উপনিষদ্। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা চরিত্র গঠনের প্রতি যে কর্ত্তব্য লক্ষ্য রাখিতেন শাণ্ডিল্য উপনিষদ্

সেটিকে সেদিন ঢাকা দিয়া তাঁহার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আহারের সময় উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঢাকা খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আহার গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করা হইল, তিনি ঢাকা খুলিয়া সেখানে জল খাবারের বদলে তেল দেখিতে পাইলেন এবং মনে করিলেন কেহ ভুলিয়া সেখানে তেল রাখিয়াছে, কিন্তু বাবাজীর কথার অন্যথা করে এরূপ দুঃসাহস কাহারও ছিল না, কাজেই তিনি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বাবাজী বলিলেন, "কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়, সব পি ডালো" তখন তিনি আর কথাটী না বলিয়া সেই তেলটুকু সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন। তখন শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন, "এইবার যাও ঐ নিকটের খরস্রোতা গগাস নদীর ধারে পড়িয়া থাকগে।" শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুদেবের আদেশমত নদীতে যাইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই অবস্থার পর পাহাড়ের একটা হড়কাবানে তাঁহাকে অনেক কষ্টও দিয়াছিল কারণ বারংবার ভেদ ও বমন হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইয়া বালুকাময় ও কঙ্করময় নদীর তটে পড়িয়াছিলেন। পরদিন এই অবস্থা

সে বিষয়ে প্রমাণ; আজকাল বৎসরে বৎসরে যেমন মানুষের রীতি নীতি হাবভাব চালচলন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে ঠিক এমনটি বিশ বছর আগে ছিল না তখনও প্রাচীন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলে প্রাণে আঘাত পাইত এমন লোক ছিল। একশত বৎসর আগে খোঁজ করিলে অনেক বৈদিক অনুষ্ঠান এদেশে পাওয়া যাইত, এখন ক্রমশঃ সেগুলি লোপ পাইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার দোষ দেখাইয়া অনেকে প্রাচীন বিদ্যাগুলি পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। যাহা হউক প্রাচীন যোগশিক্ষার ধারা মৃদুগতিতে যে গৌরমোহনের মধ্যে কিছু কিছু ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। শাণ্ডিল্য মুনি হইতে আরম্ভ করিয়া শাণ্ডিল্য গোত্রের যোগের ধারা যাহাদের মধ্যে ছিল তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যেই প্রাচীন যোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু দেখিতে পাইবার ইচ্ছাও আশা একেবারে বৃথা মনে করা উচিত নহে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শৈশবকালে যেরূপ আসন করিয়া বসিবার অভ্যাস দেখা যায় তাহাও কতকটা পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মের প্রভাবের আভাস।

যে কোন সম্প্রদায় লইয়া অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যেকটার মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের কিছু না কিছু আছেই দেখা যায়। সুতরাং ঐ শিক্ষা সাম্প্রদায়িক নহে।

সামলাইয়া পুনরায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। তখন বাবাজী বলিলেন, "শ্যামাচরণ বড ভাল হল. সব ময়লা সাফ হয়ে গেল।" এই দিন বাবাজী লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে তোমায় দীক্ষা দিব, উহাই প্রশস্ত সময়।" তাহার পর অর্থাৎ ভেদ ও বমন বন্ধ হইবার পর, পরদিন তাঁহাকে প্রচুর লুচি ও হালুয়া গরম গরম খাইতে দিলেন।

অকস্মাৎ পাহাড়ে সুবর্ণ-প্রাসাদ সৃষ্টি ও দীক্ষাদান।

সন্ধ্যাকালে বাবাজী তাঁহাকে লইয়া সেই পাহাড়ের উপরে এক সুন্দর প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য বর্ণনাতীত। সেই অট্টালিকার একটী ঘরে বাবাজীর, শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আরও একজন ভাগ্যবানের নিমিত্ত প্রচুর আয়োজন ছিল। নানাবিধ আসবাব, ঐশ্বর্য্য, নানা বেশ ভূষায় ভূষিত দাসদাসীরও কোন অভাব ছিল না, সোনার খাট, সোনার পিঁড়ি, সোনার থালা; শ্রীশ্রীঠাকুরের মনে হইতে লাগিল সবই যেন একটা রূপকথার বিষয় সত্য হয়ে মূর্ত্তি ধরে এসেছে। সে দিন রাত্রেই বাবাজী তাঁহাদের দুইজনকে দীক্ষাদান করিলেন। প্রাচীন আর্য্যঋষিদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের চাবিটী তাঁহার হাতে পড়িল। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত সেখানে সাধন ভজন চলিল। সে রাত্র পরমানন্দে পরম সমাদরে বেশ কাটিল। তৎপরদিন প্রাতঃকালে নদীতীরে শৌচাদি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাহাড়ে সেই গুহা ব্যতীত আর কিছুই দেখা গেল না। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, একি ব্যাপার ঘটিল বুঝিলাম না, এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল আবার এখন গেলই বা কোথায়?" উত্তরে বাবাজী বলিলেন, "তোমারও ঐরূপ ক্ষমতা হইবে তখন সব বুঝিতে পারিবে।" গুরু ভাইদের কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন, বাবাজী এক এক

সময় এরূপ প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ উপাদেয় ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি পাইতেন যে তাহা কোথা হইতে সেই দুর্গম স্থানে আসিল, কে বা কাহারা তাহা আনয়ন করিল কেহই তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিত না। বাবাজী যে সর্ব্বদা একই স্থানে থাকিতেন তাহাও নহে। স্থানান্তরে যাইবার সময় প্রায় অনেক সাধুর জমাৎ বাঁধিয়া যাইত। আর তিনি তাহাদের ভান্ডারা দিয়া চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় হুকুম হইত "ডেরাডান্ডা উঠাও" আর সব চলিয়া যাইত। কোন সাধু আর অপেক্ষা করিতে পাইত না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট থাকিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত সাধনবলে অল্পদিনেই তাঁহার সমস্ত সাধন কৌশল আয়ত্ত হইয়া গেল। সাত দিনেই সমস্ত সাধনার ব্যাপার সমাধা করিয়া লইলেন। এমন কি সেই স্থানেই তাঁহাকে দিয়া তাঁহার গুরুদেব কয়েকজন সাধুকে দীক্ষাও দেওয়াইয়াছিলেন।

মন্তব্য ঃ- অনেকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিযা বিরক্ত হইবেন, এই জন্যই চাণক্য পন্ডিত অলৌকিক ঘটনা সত্য হইলেও প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনেক ঘটনাই অনেকে শপথ করিয়া মিথ্যা বলেন আবার এমন মাননীয় লোকও আছেন যাঁহারা শপথ করিয়া সেই গুলিকেই সত্য বলেন। অনেকে গ্রন্থকার ও গ্রন্থকে নিন্দা করিযা তৃপ্তি পেতে পারেন, এ বিষয়ে গ্রন্থকার নিরুপায।

****

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী।
দীক্ষাস্থানের বিবিধ ঘটনা।

রাণীক্ষেত ও অশ্বত্থামা

রাণীখেত পাহাড়ের ১৪/১৫ মাইল দূরে দ্রোণগিরি নামে এক পাহাড় আছে। দ্রোণাচার্য্যের নামানুসারে ঐ পাহাড়ের নাম দ্রোণগিরি। দ্রোণাচার্য্য ও পঞ্চপাণ্ডবেরা নাকি কিছুকাল ঐ স্থানে ছিলেন। যাহা হউক ঐ পাহাড়ের উপর এক মন্দির ছিল। প্রত্যহ মধ্যরাত্রে এক খড়মধারী সাধু সেখানে আসিতেন। মন্দির সব সময়েই বন্ধ থাকিত কেবল সেই সাধু আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিতেন। তখনও ঐরূপ সাধুরা রাণীখেত অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যান নাই একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে দেশের লোকেরা, সমস্ত সাধুরা, এবং বাবাজীও ঐ সাধুকে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই অশ্বত্থামা নাকি অথর্ব্ব বেদের পূর্ব্বের লোক এবং মহাভারতের বর্ণিত যুদ্ধও নাকি অথর্ব্ব বেদ লিপিবদ্ধ হইবার বহু পূর্ব্বের একটী সামান্য যুদ্ধ ঘটনা এবং অথর্ব্ববেদ নাকি দশহাজার বৎসরের অপেক্ষাও প্রাচীন কালের গ্রন্থ। সে যাহা হউক ঐ মন্দিরস্থান বাবাজীর গুহা হইতে চারি পাঁচ মাইলের মধ্যেই ছিল। মন্দিরে যাতায়াত কালে ঐ অশ্বত্থামার শরীরের চারিদিকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বহু দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইত ও মনে হইত যেন একটা আলোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ সাধু মন্দিরের মধ্যে মধ্যরাত্রে কি করিতেন তাহা তিনিই জানিতেন কিন্তু অল্পক্ষণ থাকিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেন। কেহ সে সময় ঐ মন্দিরে যাইত না। বাবাজী যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এই ঘটনা দেখাইয়াছিলেন একথা শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির নিকট শুনা যায়। বাবাজীর নিকট প্রায় সকলেরই শুনা ছিল যে সেই

পাহাড়ের উপর যে কোন রোগীকে তথাকথিত অশ্বত্থামার উপর নির্ভর করিয়া ফেলিয়া রাখিলে সে রোগমুক্ত হইয়া যায়। দ্রোণগিরি তখন এবং এখনও নানাবিধ ঔষধের গাছ গাছড়ায় পরিপূর্ণ।

বাবাজীর গুহা হইতে কিছুদুরে একটী ডোবার মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পাহাড়িয়া ফল ফলিত; বাবাজী অনেককে তাহা খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন কারণ ফলগুলি মিষ্ট এবং দেখিলেও খাইতে লোভ হইত।

বিষফল ও অশ্বথামা

ঘটনাক্রমে একজন শিষ্য পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একদিন সেই ফল খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার ফলে লোকটির হাত পা সমস্ত জড়ীভূত হইয়া ঠিক একটা কুমড়ার মত হইয়া পড়িয়াছিল এবং খুব ভেদ ও বমন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীরা লোকটীকে সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া কি করা যাইবে ভাবিতেছেন এমন সময় বাবাজীর কথিত দ্রোণগিরি পাহাড়ে অশ্বত্থামার কৃপার কথা তাঁহাদের মনে পড়িল। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সেই পাহাড়ের উপর লইয়া যাইতে হইবে ঠিক হইল। অনেক চেষ্টার পর সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে সেই মন্দিরে যাইবার পথে পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিয়া আসিল।

সেই লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা পরদিন সকলকে বলিলেন। ঠিক মধ্য রাত্রে এক সাধু খড়মের শব্দ করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে একটা বেশ জ্যোতিঃ দেখা গিয়াছিল। সাধু নিকটে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া "কেরে তুই" এই কথা বলিয়া দুইবার পদাঘাত করিবামাত্র সেই রুগ্ন ব্যক্তি পাহাড়ের একটা নিম্নস্তরে পড়িয়া গেল। পড়িয়া যাইবার পর তাঁহার দেহে তেজ এবং নববলের সঞ্চার হইল

এবং সকল রোগ দূর হইয়া গেল। ইহার পর সেই পীড়িত লোকটী মন্দিরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পায় নাই। প্রত্যুষে আবার সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করিয়া একটা আলোককে চলিয়া যাইতেও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

পাগড়িতে নদীপার।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার একজন কৃতী গুরুভাই ও অপর কয়েকজন সাধু একত্রে শৌচাদি করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ নদীর অপর পারে গিয়াছিলেন। যাইবার সময় নদীতে বেশী জল ছিল না সুতরাং সকলে অনায়াসে হাঁটিয়া পার হইয়াছিলেন কিন্তু ফিরিবার পথে নদী পার হইতে যাইবেন এমন সময় একটা পাহাড়ে হড়কা বানের খরস্রোতে তাঁহারা বাধা পাইলেন। জল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে যাইতে হইবে। সকলে নিশ্চেষ্ট কিন্তু সেই কৃতী গুরুভাই নিজের মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া ফেলিলেন। পাগড়ীর কাপড় প্রায় একুশ হাত লম্বা ছিল, তিনি তাহাতে সাতটা গাঁট লাগাইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহারা সাতজন ছিলেন। সিদ্ধ গুরুভাই অপর সকলকে বলিলেন, "এই পাগড়ী নদীতে ফেলিয়া দিতেছি, আপনাদের ওপারে লইয়া যাইবে। আমি এই পাগড়ীতে শক্তি সঞ্চার করিতেছি। সকলেই সেই কৃতী শিষ্যের ক্ষমতার কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সকলেই সেই পাগড়ী ধরিলেন। পাগড়ী তাঁহাদের সাতজনকে লইয়া সোজাসুজি অপর পারে লাগিল এবং কাহারও কোন কষ্ট হইল না। এই কৃতী গুরুভাইয়ের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। অষ্ট সিদ্ধি যথাঃ (১) অণিমা অর্থাৎ স্বয়ং অণুর ন্যায় হইয়া যাওয়া; (২) লঘিমা অর্থাৎ স্বয়ং বায়ু অপেক্ষাও লঘু হইয়া শূন্য পথে অবস্থান; (৩) প্রাপ্তি অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সকল বস্তু পাওয়া; (৪) প্রাকাম্য অর্থাৎ সর্ব্বত্র দৃষ্টি; (৫) মহিমা অর্থাৎ বিরাট ধারণ; (৬) ঈশিত্ব অর্থাৎ সমস্ত ভূতগণকে ইচ্ছামাত্র বশীভূত করা; (৭) বশিত্ব অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বত্র গতি; (৮) কামাবসায়িতা অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র যে কোন স্থানে

অবস্থানের ক্ষমতা। শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুভাইকে পাগড়ীতে শক্তি সঞ্চার করিতে দেখিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পাগড়ীতে পার হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইল। তাহাতে তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন যে উহা অষ্টসিদ্ধির ফল এবং শীঘ্রই তাঁহারও ঐরূপ ক্ষমতা হইবে। যোগ সাধনার দ্বারা উন্নতিলাভ হইলে তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি ক্ষমতা আসিয়া পড়ে মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সকল ক্ষমতা লাভই উদ্দেশ্য নহে এবং ক্ষমতাগুলিতে লোভ বা ঘৃণাও করিতে নাই। অনেকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া যথাস্থানে তাঁহার শক্তির পরিচয় দেওয়া হইবে বটে কিন্তু যাঁহারা নিজের মধ্যে বা তাঁহার মধ্যে আর কিছু পাইতে চান না তাঁহারা নিতান্ত মূঢ়। একটা মানুষকে চিনিতে যাইয়া কেবল তাহার ঘটি বাটি আসবাবের হিসাব করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি কম মূর্খতা? ইহা কি প্রায় সেইরূপ ব্যাপার নহে?

যাহারা যোগ বিভূতিকে ঘৃণা করে বা ভয় পায় অথবা যাহারা যোগ বিভূতিকেই সার মনে করে তাহাদের উভয়কেই ধিক্। অনেকে বিভূতির নাম শুনিলেই একটা ঘৃণার ভাব দেখান। কিন্তু যাহা ভগবানের দান তাহাকে রুচির বিকারেই ঘৃণা করা হয়। যে সাধু সে ঘৃণাও করিবেনা এবং আকাঙ্খাও করিবে না। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা ছাই দেখিয়া আগুনের সন্ধান করেন, ঠিক তেমনি বিভূতি দেখিয়া সাধুর সাধনাটা জানিয়া লওয়ার কোন দোষ নাই। ভগবান্ যেন হচ্ছেন আগুন আর সাধুর শক্তি হচ্ছে বাজে ছাই, কিন্তু ছাই হলেও তার তলার জিনিষ আগুন ত সংগ্রহ করিতে হইবে। যে যত শক্তির পরিচয় দেখিতে পায় সেই তত ভগবানে বিশ্বাসী হয়, আবার শক্তির পরিচয় কেবল যে যোগ বিভূতিতেই আছে তাহাও ত নহে।

অনেক সাধুর দীক্ষার অভাবে আত্মহত্যা

* শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সহজেই দীক্ষা পাইয়া অনেকে সাধনভজনে

অবহেলা করেন দেখিয়া সময় সময় শাসন করিয়া তিনি একটী গল্প বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে এ দীক্ষা সরল বলিয়া অত অবহেলার যোগ্য নহে, ইহা বাঁদরের গলায় মুক্তার হারের মত হওয়া উচিত নয়, "নষ্ট করিবার সময়" সবাই পায় কিন্তু এই কাজেই যত আলস্য। সত্যই নয় কি?

"খুঁজে ধরা মনের গড়া,
কতকর্ম্ম করলিশেষ,
যে কাজে তুই এলি ভবে,
সেটিই কি তোর বাকি রবে?
ভবার্ণবে পার হতে পার
পাবে কি? — পাবে কি?"
যে দিকে যেতে করব মানা,
সে দিকে না গেলে নয়,
যেখানে তোর লাভের আশা,
সে দিকে তোর জুজুর ভয়,

"জীবনের কাজ হলে সারা,
তখন যাবে সাধন করা,"
এখন যদি মর,
জবাব দেবে কি? দেবে কি?

"এ দীক্ষা সরল ও সহজসাধ্য বটে কিন্তু ইহা কত দুর্লভ ও লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল" এই বলিয়া বলিতেন; "এক জটাজুটধারী অতিবৃদ্ধ তপস্বী ফকির দীক্ষা পাইবার আশায় বাবাজীর সেই গুহার নিকটে বহুকাল ধরিয়া বাস করিতেন এবং সাধুদের সেবা করিতেন। একদিন সেই ফকির কাতরতা প্রকাশ করিয়া বাবাজীর নিকট তাঁহার দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে বাবাজী অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার নিকট তোমার কোন পাওনা নাই, তুমি বৃথা এতকাল অপেক্ষা করিতেছ। এই কথা শুনিয়া ফকির প্রতিজ্ঞা করিয়া

বসিল, "আজ যদি আমাকে দীক্ষা না দেন তবে আজই আমি পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব।" বাবাজী সেই ফকিরের সমস্ত কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিকট দীক্ষা পাইবে না। তোমার প্রাণ যদি এত সস্তা হইয়া থাকে তবে যাও মরগে, প্রাণ বড় সস্তা হয়েছে না!" বাবাজীর অনেক কঠোর শাসন ছিল। অনেককে তিনি ধুনীর কাঠ লইয়া প্রহার করিয়াও শাসন করিতেন। কঠোর শাসনের মধ্যে যে দয়া ছিল তাহা কাহারও নিকট গুপ্ত থাকিত না। সকলেই নিজকে শাসিত দেখিয়া সুখী হইতেন। শাসনকালেও তিনি শান্ত ও হাস্যপ্রিয় ছিলেন। সেই তপস্বী ফকির তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সত্য সত্যই পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করেন এইরূপ আরও কয়েকজনকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মনে মনে খুব আঘাত পাইয়াছিলেন।

রানীখেত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ।

কয়েকদিন পরেই সাহেবের নিকট হইতে খবর আসিল যে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে এবং দানাপুরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।ঐ সময় রাণীখেতে খুব ঠান্ডা পড়িয়া আসিয়াছিল। বিদায়কাল উপস্থিত দেখিয়া শ্রীশ্রীলাহিড়ি মহাশয় বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করিবেন, গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মপ্রচারে উদারতা।

এইক্ষণে তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে যাহা দিলেন, তাহা যেন কাতর প্রার্থী মাত্রকেই দিতে পারি, আর না হলে ঠাকুর তোমার জিনিষ তুমি ফেরৎ নাও, আমার চাই না, ইহাতে যদি জীবের উদ্ধার না হবে তবে আমি ইহা লইয়া কি করিব?" পরম কারুণিক শ্রীশ্রীকাশীর ঠাকুরের অনেক অনুরোধের ফল ফলিল। তিনি গৃহী প্রভৃতি সকলকেই উপদেশ ও দীক্ষাদানের অনুমতি পাইলেন এবং অন্যকে দিয়া দীক্ষাদানের অনুমতি দিবার ক্ষমতাও পাইলেন।

দীক্ষার অধিকার।

কেহই ভক্তিপরায়ণ, সংযমী ও নিষ্ঠাবান্ না হইলে উপদেশ পাইবে না বাবাজী এইরূপ আজ্ঞা দিলেন। বাবাজী আরও বলিলেন, "কপটকে ক্রিয়া দিলেও তাহা তাহার বোধগম্য হইবে না এবং তাহাদের দীক্ষা দিলেও তাহা না দেওয়াই হইবে; পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ ভাব যাহার নাই, মদ্যাদি পানদোষ যাহার আছে, এবং সর্ব্বোপরি যে প্রত্যহ এক নিয়মে ক্রিয়া করিবে না তাহাকে "ক্রিয়া" নামক উৎকৃষ্ট দীক্ষা দিবে না। দিলেও তাহা দেওয়া হইবে না।" সুতরাং "কোন নেশা করিব না, পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ দেখিব, আজীবন প্রত্যহ ক্রিয়া করিব।" এই তিনটী হইল দীক্ষাকালের প্রতিজ্ঞা।

ক্রিয়ান্বিতদের অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত।

ক্রিয়াদানের বিধিনিষেধ বুঝাইয়া দিয়া লোকে যাহাতে অশ্রদ্ধান্বিত না হয় সেইজন্য অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সকলের নিকট পাঁচ টাকা ও বিধবার নিকট দশটাকা লইয়া সেই টাকা বাবাজী জমাইয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে লোকে যে জিনিষ বিনা পয়সায় কুড়িয়ে পায় তাহাকে তাহারা আদর করে না, কিন্তু একটা বাজে জিনিষও বেশী দাম দিয়া কিনিলে অন্ততঃ একবার ইহার ভিতর কি আছে দেখা যাক্ বলে সেটা নেড়ে চেড়ে ভাল করে দেখতেও ইচ্ছা হয়।মানুষ অর্থের দাস তাহা না হইলে টাকা দিতে কেঁউ কেঁউ করবে কেন? টাকার উপর মানুষের প্রাণ নির্ভর করে সুতরাং টাকা দিয়ে সহজেই মানুষের মন পরীক্ষা হয়। আর দাম দিয়ে কিনলে একটা আদর বাড়ে। আর এ জিনিষ এমনি যে সেই খাটবে সেই এর প্রত্যক্ষফল দেখে দেখে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে আরও খাটতে চাইবে, ইহার মধ্যে একটা নেশা ও আনন্দ পাইয়া আর ইহা ছাড়িতে চাহিবে না।

ইহার উপর আছে তাঁহার করুণা। কিন্তু হায়! মানুষ এমনি অলস যে তাহাকে বারংবার প্রাণ দিয়ে ভালবেসে টেনে ধরে তুল্লেও সে ধপাস্ করে বসে পড়ে।তবে কি কোন আশা নাই? না আশা আছে। জীবের আশা আছে, বিশ্ববিজয়িনী করুণা দিয়ে তিনি সর্ব্বস্বহরণ করিয়া একদিন তার মিথ্যা মোহ্ ভাঙ্গবেনই ভাঙ্গবেন। একদিন তার প্রাণ মন সকলই সেই বিশ্বচোর চুরি করবেন। আমরা হীনমতি তাঁহার করুণার কি বুঝিব!

দীক্ষার টাকা কে লইত?

দীক্ষার জমান টাকা বাবাজী স্বয়ং আসিয়া বা লোক মারফতে মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন। এমন কি প্রায়শ্চিত্তের টাকা অন্য টাকার সহিত মিশাইতেও নিষেধ ছিল। এই অর্থ প্রথমে বাবাজী স্বয়ং সাধুভোজনের নিমিত্ত ব্যয় করিতেন। ঐ টাকায় সাধুদের ভান্ডারা দেওয়া হইত। নিয়ম ছিল শিষ্যদীক্ষা গ্রহণ কালে গঙ্গাজল ও তামাতুলসী লইয়া এবং পঞ্চ রজত মুদ্রা রাখিয়া গুরুর নিকট নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিবে। এখন কোন নির্দ্দেশ মত দীক্ষার টাকা ব্যবহারের উপায় না পাওয়ায় তাঁহার কৃতী প্রতিনিধিগণ ঐ টাকা তাঁহার স্মৃতি ভান্ডারে প্রদান করিবেন অথবা কোনরূপ স্মৃত্যুৎসবে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন এই অর্থ অযথা আত্মসাৎ করা উচিত নহে।

রাণীক্ষেত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রিয়াদানের বিধি নিষেধ বুঝিয়া লইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ যুগল বন্দনা করিয়া তথা হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে একবার কাশীধামে উপস্থিত হন। পরে দানাপুরে ফিরিয়া আবার পূর্ব্ববৎ অফিসে কার্য্যে নিবিষ্ট হন।

বাবাজীকে আকর্ষণ করিয়া প্রদর্শন।

রাণীক্ষেত হইতে ফিরিবার পথে তিনি একস্থানে বিশ্রাম লইবার জন্য জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানে অনেক বাঙ্গালী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন তর্কচ্ছলে বলিয়া বসিলেন আজকাল সাধু বলিতে কিছুই নাই। এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "সাধু আছে বৈকি? এমন কি আমি ইচ্ছা করিলে এখানেই একজন সাধুকে ধ্যানবলে আনাইয়া দেখাইতে পারি।" তখন সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিযা সাধু দেখিতে চাহিলেন, এবং এরূপ ভাবে সাধুর দর্শন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বুঝিয়া সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? তখন অনুরোধে পডিযা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তোমরা আমাকে একটা নির্জ্জন ঘর দাও ও তাহার চারিদিকের দরজা জানালা বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া দাও, সেই ঘরের মধ্যেই আসমান হইতে এক সাধু আবির্ভূত হইবেন। ঘরের মধ্যে কেবল বসিবার জন্য দুই খানি পবিত্র নূতন আসন থাকিবে। তোমরা বাহিরে কোনরূপ শব্দ না করিয়া একঘন্টাকাল স্থির ভাবে অবস্থান কর। আমি ধ্যান করিয়া সাধুকে আকর্ষণ করিব।"

বাবাজীর কাছ হইতে বিদায় লইবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে কোথায় ও কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাবাজীর করুণার সঞ্চার হয় এবং বলিয়া দেন যে তিনি যেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া স্মরণ করিবেন সেইখানেই তিনি আবির্ভূত হইয়া দর্শন দিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই কৃপাতেই আত্মহারা হইয়া বিনা কারণে তর্কের খাতিরে সাধু দেখাইবার জন্য একটী আসনে বসিয়া বাবাজীকে স্মরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বাবাজীর কথা মিথ্যা হইবার নহে সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটা জ্যোতির মধ্য হইতে আবির্ভূত

হইয়া স্থূল শরীরে সেই স্থানে অপর আসন অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে বুঝি তামাসা দেখাইবার জন্য এই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলাম। আমি কত প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম এবং তোমার নিকট হইতে কোন্ সুদুর প্রদেশে ছিলাম, তুমি সামান্য প্রয়োজনে আমাকে সেই সমস্ত কার্য্যের ক্ষতি করাইয়া এতদূরে টানিয়া আনিলে। যাহা হউক এইবার তোমার মান রক্ষার জন্য ও আমার বাক্য রক্ষার জন্য দেখা দিলাম; ভবিষ্যতে তুমি স্মরণ করিলে আর আমার দেখা পাইবে না। আমি নিজেই তোমার প্রয়োজন বুঝিয়া আসিয়া দেখা করিব।"

ঐ সময় সকলে আসিয়া বাবাজীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া প্রণাম করিলেন, বাবাজীও তাঁহাদের দর্শন দিয়া অনতিবিলম্বে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। সকলে শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের এই ঘটনা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি বাবাজীর বিরক্তি দেখিয়া যথেষ্ট দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কি করিবেন তখন ত আর কোন প্রতিবিধানের উপায় নাই।

শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় যখন রাণীখেতে অবস্থান করিতেছিলেন তখনকার অনেক ঘটনা তিনি সেখানকার লোকদের বলিলেন এবং এই ঘটনার পর একটা নিমন্ত্রণের গল্পও বলিলেন।

বাবাজীর সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা।

একদিন জনৈক ব্যবসায়ী বাবাজীকে ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে কোন এক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন। বাবাজী তাহাতে অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন এবং আরও বলেন যে প্রথমেই আমরা আহার করিব এবং একটু সকাল সকাল যাইব। সেই ব্যবসায়ী কতকগুলি লোকের আহারের আয়োজন করিয়াছিলেন। বাবাজী ও শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়ে একটু পূর্ব্বে লোকটার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই লোকটা ব্যস্ততার সহিত বাবাজীকে ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে পরম

সমাদরে বসাইয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি উপস্থিত করিলেন। এ দিকে বাবাজী নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত আয়োজিত সমস্ত খাদ্য উদরসাৎ করিয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন না দেখিয়া নিমন্ত্রণকর্ত্তা নিতান্তই চিন্তিত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ডাল, তরকারী যখনই যাহা আনিয়া দেন বাবাজী তাহা গ্রহণ করিয়াই বলিতে থাকেন, "আউর কুছ" এবং আর কিছু আনিবার পূর্ব্বেই পাত্রস্থ সমস্ত বস্তু উদরসাৎ করেন। এইরূপ করিয়া আর কতক্ষণ চলে, সমস্ত আয়োজিত অন্ন শেষ হইল। কাজেই, এইবার লোকটীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর আর স্থির থাকিতে না পারিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, আপনি কি লোকটার সর্ব্বনাশ করিতে চান।" তখন বাবাজী উত্তর করিলেন, "ক্ষমতা ত এক ছটাকের, যখন দেবার ক্ষমতা নাই তখন মনে মনে এত দর্প কেন? এখন দিক্ দেখি! লোকটার ধনগর্ব্ব বড় বেশী!" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর সেই লোকটীর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বুঝাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং লোকটীও অত্যন্ত শরণাপন্ন হইয়া পড়িল। তখন বাবাজী ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিজের গুহায় ফিরিয়া আসিলেন। লোকটী আবার নূতন প্রাণে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগেব জন্য আয়োজন করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিল।

বাবাজীর কায়াকল্প

শুনা যায় বাবাজীর বয়ঃক্রম পাঁচশতেরও অধিক, দেখিতেও তিনি সুপুরুষ যুবা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মত। কেহ কেহ তাঁহার দর্শন লাভও করিয়াছিলেন। বাবাজী এক প্রকার পাহাড়ে লতা দেখাইয়া ছিলেন তাহা দেখিতে ঠিক সাপের মত; ইহাকে তিনি সোমলতা বলেন। এই সোমলতা খাইয়া নাকি সিদ্ধ যোগীরা স্থিরভাবে অবস্থান করেন ও যোগ প্রভাবে আভ্যন্তরিক শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া জীবিত থাকেন। ঐ লতা প্রক্রিয়া অনুসারে খাইলে সমস্ত শরীরের মাংস গলিয়া নূতন মাংস গজাইয়া উঠে। এই রূপে যে নব কলেবর লাভ হয় তাহা বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বাবাজী একবার এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ইহাকে কায়াকল্প কহে।

মানুষ কেমন করিয়া হাজার বৎসর বাঁচিতে পারে?

কায়াকল্প ছাড়া আরও অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরকে দীর্ঘকাল তপঃক্ষম করিয়া রাখা যায়। উপনিষদকার বলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। শরীর ঠিক রাখিতে না পারিলে কোন কর্ম্মই করা যায় না। মানসিক বল ও মানসিক সাধনার দ্বারাই যোগীরা শরীরকে স্থির রাখেন। যাহারা মূর্খ তাহারাই মনে করে যোগীরা জ্ঞান বা ভক্তি প্রভৃতি কোন মানসিক ক্রিয়া অবলম্বন করেন না, কেবল শরীর লইয়াই থাকেন। বস্তুতঃ যোগীরা মনোরাজ্যে অবলীলাক্রমে অবস্থার পর অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন এবং অত্যন্ত উন্নত অবস্থা পাইয়াও "ইহা আর বিশেষ কি, ইহাতে বিচলিত বা উন্মত্ত হইয়া বাহাদুরি করিবার কিছু নাই" মনে করেন। জ্ঞানী জীব ভগবানকে সৎ চিৎ আনন্দ বা অস্তি, ভাতি ও প্রীতি বলিয়া থাকে। সৎচিদানন্দকে উপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ উচ্চ ধরণের মানসিক ভাবাবস্থার দ্বারা শরীরটিকে সবল সুস্থ ও উপযুক্ত রাখিতে হয়। যে সকল প্রক্রিয়া ঋষি ও যোগীরা কত কষ্ট করিয়া, কত সহ্য করিযা, কত পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজকাল তাহা সহজে দেখা যায় না।

সর্ব্বধ্বংসী কালের কি প্রভাব! উপযুক্ত পাত্রের অভাবে সে সকল ক্রিয়াই লোপ পাইতেছে। আমরা নিতান্ত অজ্ঞ, এ সকলের কি বুঝিব! এখন সমস্তই অলৌকিক মনে হয়। সহস্র বর্ষ পরমায়ুঃ লাভ দুর্লভ হইলেও অসম্ভব নহে। বৈদিক প্রাণায়াম যোগীদের আয়ুঃ বৃদ্ধির একটা কারণ ছিল। পূর্ণ প্রাণশক্তির আবেগ লইয়া মানুষ যে কত আনন্দে, স্বচ্ছন্দে ও স্থিরভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কেবল পার্থিব শরীর রক্ষার জন্য আত্মরক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এটা তাঁহারা জানিতেন যে আত্মা নষ্ট হইবার নহে। সুতরাং জীবন ও মরণ দুই তাঁহাদের নিকট তুল্য। তাঁহাদের তপস্যার পবিত্র [illegible] প্রভাবে কল্যাণকামী জীবের মঙ্গল হয় এইজন্য যোগীরা দীর্ঘ জীবন ধারণ করিয়া নিমগ্ন চিত্তে

তপস্যা করেন। ব্রহ্মত্ব লাভ ও কল্যাণকামীর মঙ্গল সাধন একই কর্ম্মেব দুইটী ফল। দীর্ঘজীবনলাভ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক গবেষণা দিয়া প্রাচীন মতের সমর্থন করা যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই কিন্তু বাহুল্য ভয়ে কেবল একটী মাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত হইল।

উত্তরগীতায শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সদাকালং বায়ুস্বীকরণং পরম্। সর্ব্বকালপ্রয়োগেণ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ।।" অর্থাৎ কি চলিতে চলিতে, কি অবস্থিতিকালে, সকল সময়ে প্রাণায়াম করা উত্তম। সকল সমযে এইরূপ করিলে মানুষ সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে অর্থাৎ তাহার আয়ুঃ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যায়। অনেকে মনে করে যে ইঁট পাথরের মত নির্জীব হইয়া পডিয়া থাকাকে সমাধি বলে এবং এই রকম ভাবে সহস্র বৎসর থাকা যায়। ইহাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নাকি? কখনই তাহা নহে, কারণ সেই পরমায়ুঃ লইয়া কি আমরা ধুইয়া খাইব, ঐ রূপ যদি হয় তবে সেই দীর্ঘজীবন ত নিস্পন্দ ও নিষ্ক্রিয় হইবে। কে এইরূপ ব্যর্থ দীর্ঘজীবন চাহিবে? কেহই না। উত্তর গীতায তাই দেখান হইয়াছে "গচ্ছন্, তিষ্ঠন্" প্রভৃতি অর্থাৎ সে জীবন কর্ম্মময়। উচ্চ সাধক শুচি ও দক্ষ হইয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা এ কথাও বলেন। আবার নিষ্ক্রিয় সমাধির অবস্থা প্রবল কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে বিশ্রামের নামান্তর মাত্র। সিদ্ধ যোগীদের কর্ম্মসূত্র মূর্খ মানবের নিকট অজ্ঞাত আছে। আবার সমাধিলব্ধ স্থৈর্য্য চরিত্রবলের প্রধান উপাদান। জীবনে সকল কর্ম্মে সিদ্ধিলাভের মূলে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের মূল্য কে না স্বীকার করে?

বাবাজীর দেহরক্ষার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষাপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পরে বাবাজী রাণীক্ষেত্রের আরও উত্তরে কোন একটী স্থানে দেহরক্ষার সংকল্প করিয়া আসনস্থ হন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাবাজীর আশ্রমে এক তপস্বিনীকে দেখিয়াছিলেন। ইনি বাবাজীর সহোদরা ভগ্নী। ইঁহাকে লোকে মাতাজী বলে। মাতাজী যোগবলে দূর হইতে তাঁহার দেহ রক্ষার সংকল্প অবগত হন এবং

তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। মাতাজী তাঁহাকে বলেন যে আপনার পক্ষে দেহে অবস্থান ও বিদেহ অবস্থা দুইই সমান সুতরাং এই লীলাশরীর রক্ষা করুন, ইহাতে জগতের কল্যাণই হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতাজীকে জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম শরীরে বাবাজীর নিকট আকাশ পথে যাইতে দেখিয়াছিলেন এবং অন্যকেও দেখাইয়াছিলেন।

মাতাজীর আশ্রম

শুনিয়াছি মাজী বা মাতাজীর ধুধুপানিতে আশ্রম ছিল। তিনিও বাবাজীর ন্যায় বহুকালের লোক। তিনি কেবল দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতেন। তাঁহার আশ্রমে কুকুর গুলি গরু গুলিকে পাহারা দিত । এমন কি বাঘেরও সাধ্য ছিলনা যে সেই কুকুরদের হাত হইতে একটা গরু লইয়া যায়। যাহা হউক শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং কিছু পরে বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখনও মাতাজী সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে বাবাজীকে তাঁহার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঐ সময় বাবাজী তাঁহাদের উভয়কে একটা হাঁড়ি হইতে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন। হাঁড়ি হইতে ক্রমাগত খাদ্য দিবার পরও হাঁড়িটি খাদ্যপূর্ণ রহিল।

****

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী।

প্রথম ধর্ম্মপ্রচার।

দীক্ষা পাইয়া ফিরিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর একেবারে দানাপুরে যান নাই। প্রথমে তিনি কাশীতে যান। কাশীতে কেদার ঘাটের কাছেই

নারদ ঘাটের একজন মালীকে তিনি প্রথম দীক্ষা দেন। এই মালীর নাম ছিল যোগী মালী, সে খুব ভক্তিমান্ ছিল এবং প্রত্যহ কেদার ঘাটে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ধনী বা বিদ্বান্ কত লোককে ছাড়িয়া এই মালীকেই নাকি প্রথম দীক্ষা দিলেন, সত্যসত্যই শ্রীভগবান্ কাঙ্গালের ধন। তিনি ঐশ্বর্য্যের বা বিদ্যার বাধ্য নহেন, এমন কি সাধনার বাধ্যও তিনি নহেন। যে তাঁহার কাছে কাঙ্গাল সাজিয়া কৃপার ভিখারী হইতে পারে, যে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে, ''তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী'' শ্রীভগবান্ নিজ কৃপায় তাহার হৃদয ভরিযা দেন, তিনি তাহার হইয়া যান। তাঁহার অপর এক পুরাতন প্রথম কার শিষ্য ঘৃত বিক্রয় করিত তাহার নাম গদাধর সা। ইহার পর আর একবার যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি রামপ্রসাদ উকিল প্রভৃতি অনেককে দীক্ষা দেন। এই দীক্ষাদানকালে তিনি জানাইয়া দিতেন বংশগত গুরু বা গুরুমন্ত্র বা কুলগুরু ত্যাগ করিবে না বা সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা নষ্ট করিবে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় কোন সম্প্রদায় গঠন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সনাতন যোগতত্ত্ব মানবের স্বাভাবিক সম্পত্তি। ইহাতে আগ্রহকারী মাত্রেরই অধিকার আছে। যাহারা আত্মোন্নতি চায় তাহাদের এই যোগতত্ত্বের সাহায্যে সর্ব্ববিধ সুযোগ উপস্থিত হয়। জড়বিজ্ঞানের নানা শাখা আয়ত্ত করিয়া মানুষ যেমন জ্ঞানোন্মেষ করে অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্চ্চাও সেইরূপ এবং ইহা জাতিধর্ম্ম বা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই আলোচ্য এবং পালনীয়। নিষ্ঠা বা ক্রমাগত নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকিলে তবে মানুষ এক একটা কাযের ফল বুঝিতে পারে, তাই বড় ভয় হয় মানুষ একটা গভীর সাধনার পথ জানিয়া লইয়া পরে দুই চারিদিন বা দুই চারি বৎসর অনিয়মিত ভাবে একটু সাধনা করিয়া পরে তাহা ছাড়িয়া দিবে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের লোকের ধৈর্য্য অতি অল্প কাল থাকে। তাই দীক্ষার প্রথম পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য্য ও আগ্রহটুকু বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইতেন। তাঁহার প্রথম সর্ত্তই ছিল লাগিয়া থাকিতে হইবে, ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, কারণ প্রথম প্রথম ভাল লাগিয়া মাঝে আর তত ভাল লাগে

না, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া যাইতে পারিলে শেষে ভাল লাগে। জীবনে অসীম ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবে শিব

যাহা হউক কাশী হইতে তিনি দানাপুর কর্ম্মস্থানে ফিরিলেন। পূর্ব্বের মত অফিসে যাইতেন এবং বাসায় আহারাদি করিতেন। বাসায় তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন এক সাধু একটা গাছতলায় বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। পূর্ব্বে এরূপ সাধুকে দেখিলেই তাহাকে বদমাইস বলিয়া মনে করিতেন। এখনও তাঁহার মনে জীবের প্রতি ঘৃণার ভাব আছে তাঁহার অন্তর্যামী গুরু ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের আর এক শিক্ষা লাভ হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব সেই ফকিরের লোটা মাজিতেছেন। তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দানাপুরে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার দুর্গতির কারণ না বুঝিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আপনি এই গাঁজাখোর সাধুর লোটা মাজিতেছেন কেন? এই সাধু কে?" উত্তর হইল, "আমি সাধু সেবা করিতেছি, সকল ঘটেই নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, তুমিও সকলের মধ্যে তাই দেখনা কেন?" অতঃপর বাবাজীকে তিনি বাসায় লইয়া গিয়া কিছু জলযোগ করান এবং পরে তিনি চলিয়া যান। এই ঘটনায় তাঁহার মধ্যে সর্ব্বজীবে নারায়ণ দর্শন করিবার একটা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়। সেই হইতে দুষ্টলোককেও তিনি দূর হইতে মনে মনে নারায়ণজ্ঞানে প্রণাম করিতেন। বাবাজী জাতিবর্ণ বিচার না করিয়া মনুষ্যদেহধারী মাত্রকেই তাহার সংস্কার দেখিয়া ক্রিয়া দিতেন। কোন কোন ভাগ্যবান্ বাবাজীকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে আদিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন।

বৃন্দাভকৎ ? যোগের ধারা সনাতন ও স্বাভাবিক।

দানাপুরে যাইয়া বৃন্দা ভকত না কোন্ এক সিপাহীকে তিনি দীক্ষা দেন। দানাপুরে সেই তাঁহার প্রথম শিষ্য। সাধকের জ্ঞান ও শাস্ত্র পাঠের জ্ঞান এ দুইয়ের প্রভেদ অনেক। বৃন্দাভকত সাধনার অবস্থা পাইয়াছেন সুতরাং শাস্ত্রীয় কথার এরূপ মীমাংসা করিতেন যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

ইনি ভকৎজী নহেন।

একবার বাঁকিপুরে কোনও এক জমিদারের সম্মুখে সেই সিপাহীর কয়েকটি পন্ডিতের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা হয়। বৃন্দাভকত শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে সামান্য সিপাহী হইয়াও পন্ডিতদের সমস্ত যুক্তিজাল খন্ডন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মে এক সত্য ইহা প্রমাণিত করেন। বৃন্দা ভকত সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে যোগ অবলম্বন করুক বা নাই করুক সমস্ত সাধনাতেই যোগের ধারা ফুটিয়া উঠিবে। সাধনার প্রত্যেক রহস্যই যোগরহস্য এবং যেখানেই শাস্ত্রে কূট প্রশ্ন আছে সেখানেই যোগের তত্ত্ব নিহিত আছে। যোগ ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের একটীকে ধরিলে অপরগুলি আসিয়া পড়ে। ছয়টা দর্শন ছয়টা পথ নয় একই রাস্তার বিভিন্ন অংশের ছয়টা নাম। সকলেই তাঁহার যুক্তিসম্মত মত স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে বৃন্দাভকতের জয়লাভ হইল। "সিপাহী তেরা এত্ না জ্ঞান ইত মেস্না নেহি জানা রহা।" অর্থাৎ সিপাহী তোমার এত জ্ঞান একথাত আমার জানা ছিল না" এই কথা বলিয়া সেই জমিদার সিপাহীকে অনেক সন্দেশাদি খাওয়াইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক দান করেন। এইরূপে চাকরি করিতে করিতেই তাঁহার দ্বারা সনাতন ঋষিগণের পরমপূজিত অতিরহস্যময় সাধন সকল দীক্ষালাভের বৎসর হইতেই প্রচারিত হইতে থাকে। এই সাধন প্রণালীর নাম ছিল "ক্রিয়া" এবং যাঁহারা ক্রিয়া পাইতেন তাঁহাদের ক্রিয়াবান্ বা ক্রিয়ান্বিত বলা হইত।

চাকরি ও আর্থিক অবস্থা

১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫ বৎসর চাকরি করিয়া যখন তাঁহার বয়স ৫৭বৎসর তখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বৃত্তি বা পেন্‌সন্ পান। তিনি দীক্ষার পূর্ব্বে দশ বৎসর এবং দীক্ষার পর ২৫ বৎসর মোট ৩৫ বৎসর চাকরি করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি একশত টাকা বেতন ও ভাতা অর্থাৎ অতিরিক্ত বৃত্তি বা খোরাকি খরচা পাইতেন, পরে যখন পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন তখন হইতে প্রায় দশ বৎসর মাসিক ত্রিশ টাকা মাত্র পাইতেন। তখনকার দিনে এ ত্রিশটাকাও কম নহে. তখন ঐরূপ সামান্য টাকায় লোকে বিলাসব্যসন না থাকায় বেশ সুখে জীবন যাপন করিত, এখন একশত টাকা পাইলেও তখনকার ত্রিশ টাকায় যাহা হইত তাহা আর হয় না। তখন পাঁচশত, সাতশত বা হাজার টাকায় যে ঘর বাড়ী পাওয়া যাইত এখন তাহা কিনিতে হইলে ঠিক দশগুণ মূল্য দিতে হয়। তিনি কাশীতে পাঁচখানি বাড়ী স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহা ভাড়া দিতেন, জমিজমাতে মকর্দ্দমা মামলা ও হাঙ্গামার শঙ্কা থাকায় তিনি তাহা পছন্দ করেন না। তখনকার দিনে ঐ পাঁচখানি বাড়ীর মূল্য অনুমান দুই তিন হাজার টাকার অধিক লাগে নাই। এখন উহার বিক্রেয় মূল্য বিশ হাজার টাকার অধিক। পেনসন লইবার পূর্ব্বে প্রতি মাসে স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে একশত টাকা সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কারণ তিনি মাহিনার ১০০ টাকা জমা রাখিয়া অফিসে অতিরিক্ত সময়ে (overtime) কার্য্য করিয়া এবং ধনীর ঘরের ছেলে পড়াইয়া ও ভাতা লইয়া যাহা পাইতেন তাহাই তখনকার দিনে একটী ক্ষুদ্র পরিবার পালন পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

অর্থসঞ্চয়।

সুতরাং সংসার যাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহ বাদে যাহা বাঁচিত এইরূপ অর্থ দশ বৎসর মাত্র সঞ্চয় করিলে বার তের হাজার টাকা বাঁচান

যাইত এবং তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্রয়কালীন মূল্য ইহার অধিক নহে। তাঁহার তিরোভাবের পর দেখা যায় যে স্থাবর সম্পত্তি দুই হাজার টাকার এবং গভর্ণমেন্ট প্রমিসরি নোট দশ হাজার টাকার এই বার হাজার টাকাই ছিল তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

অপরিগ্রহ

নানা সৎকার্য্যে অর্থ দান না করিলে তিনি আরও সম্পত্তি করিতে পারিতেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বিষয় প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে ভুল ধারণা করেন যে তিনি শিষ্যদের নিকট হইতে অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া বিশেষভাবে ধনবান্ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শিষ্যদের প্রদত্ত কোন উপহার গ্রহণে বা কাহারও নিমন্ত্রণ, দক্ষিণা বা দান গ্রহণ না করা তাঁহাদের বংশগত প্রথা ছিল। বাড়ীর অনেকেই "আমাদের প্রতিগ্রহ করিতে নাই" এই বলিয়া অনেক দান দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রতিগ্রহ বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন এবং শিষ্যদের দীক্ষাদানকালে একবার পাঁচ টাকা বাবাজীকে পাঠাইবার জন্য লইতেন এবং পরে কোনরূপ দান গ্রহণ পরপীড়ন বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন। কেহ পোষাক পরিচ্ছদ উপহার স্বরূপে দিলে তাহাও অধিকাংশস্থলে অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া থাকিত।

১৮৫১ খৃঃ অঃ হইতে সংক্ষেপে দেশের অবস্থা।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষের অবস্থা না জানিলে তখনকার পারিবারিক স্বচ্ছলতার কথা কল্পনা করাও যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন চাকরিতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ প্রায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের সময় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিগ্রাফ, ডাক, পূর্ত্ত প্রভৃতি নানা বিভাগে উন্নতির সূচনা হইলেও তখনও দেশ বিলাসিতায় ডুবিয়া

যায় নাই। এখনকার একটী গৃহস্থের ঘরে কত আসবাব কিন্তু তখনকার একটী গৃহস্থের ঘরে তাহার কোনটীও দেখিতে পাওয়া যাইত না, তখন কোন বিলাসব্যসন ছিল না। যদিও শায়েস্তা খাঁর সময়কার মত টাকায় আট মণ চাল তিনি দেখেন নাই তথাপি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দেও টাকায় এক মন চাউল পাওয়া যাইত। খাঁটি দুধ টাকায় ষোল সের ছিল। ভাত কাপড় ভিন্ন লোকের অন্য খরচ ছিল না। চন্দন, আতর বা গোলাপের ব্যবহারই যথেষ্ট বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হইত। সমস্ত দ্রব্যই তখন সস্তা ছিল। তাহার উপর তিনি মিতব্যয়ী ও যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম ও পরিশ্রমী ছিলেন। এই সকল না জানিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অর্থশোষক ধনী গুরু মনে করিতে পারে। তিনি চিত্তাপহারক ছিলেন বিত্তাপহারক ছিলেন না, সামাজিক নিয়মানুসারে তিনি গুরুপ্রণামীও লইতেন না। তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে বাল্যকালে ঐ আত্মীয় স্বয়ং দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তাঁহার চপলতা নিরস্ত করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার নিকট পাঁচটী টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে, বলেন। বালক তাহার উপায় নাই বলায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে বলেন, "কেন, তুমি তোমার পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় করিয়া দীক্ষার টাকা সংগ্রহ করিতে পার।" যাহা হউক এই পরীক্ষার ফলে তিনি ধারণা করিলেন যে তিনি অর্থশোষক গুরুমাত্র। তাঁহার আর দীক্ষাগ্রহণ হইল না। তখন তিনি জানিতেন না যে তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রদের কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও পাঠ্যপুস্তক আবার কাহাকেও বা বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। অনেক দরিদ্র শিষ্যকে তিনি দক্ষিণার টাকা স্বয়ং দিতেন ও নানা ভাবে সাহায্যও করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি দক্ষিণা স্বরূপ কিছু গ্রহণও করিতেন তাহা হইলে তাঁহার অন্যায়ত হইতনা বরং উহা ন্যায়সঙ্গত দাবী। সাধু ভোজনের টাকা বা দীক্ষার টাকা প্রথম প্রথম বাবাজীকে দেওয়া হইত, পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমতিক্রমে ঐ টাকায় ক্রিয়াবান্‌দের খাওয়াইয়া দিতেন। আমরা সামান্য স্কুল কলেজে শিক্ষার জন্য কি কম দক্ষিণা দিয়া থাকি কিন্তু কৈ তাহাতে অন্যায় মনে করি না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দীক্ষার পর ২৪ বৎসর চাকরি করিতে করিতে নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার হয়, তিনি

কিন্তু প্রচার জন্য কোথাও যান নাই। এইরূপে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং অবসর গ্রহণের পর বৎসরই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহার্থে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) যান এবং অনেককে ঐ স্থানে অনুগ্রহ করেন, ঐ স্থানে অনেকে তাঁহার বিভূতি দেখিয়াছিলেন। এই সময় হইতে অবসরের দশ অর্থাৎ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবনের শেষ দশ বৎসর অনেক পুস্তক লেখা (প্রায় ছাব্বিশখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ছয়খানি দর্শনের ব্যাখ্যাও ইহার অন্তর্গত), শাস্ত্র পাঠ ও শিষ্যদের সহিত সদালাপে কাটে। এই শেষ দশ বৎসর মধ্যেই তাঁহার সাধনপদ্ধতি বহুল প্রচারিত হয় এবং এই সময়েই ভাস্করানন্দ স্বামী প্রমুখ বিখ্যাত শিষ্যগণ তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ

সকলের নিকট এই সময়ের ঘটনা সমূহ বিশেষ আগ্রহের ও আদরের বিষয়। সাধারণের সাহায্য ও আগ্রহ অনুসারে অন্যান্য সংখ্যায় ইহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং তাঁহার চিঠিপত্রও কিছু কিছু প্রকাশিত হইবে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, শ্রীহলধর বাস লিখিত, খড়বাংলা (বিষ্ণুপুর) হইতে একটী পোষ্টকার্ডের অবিকল ছবি তাঁহার স্বাক্ষর পরিচয় জন্য প্রেরিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনচরিত, তাঁহার ব্যাখ্যাত পুস্তকগুলির প্রচুর গবেষণা, তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বিশেষত্ব ও প্রাচীনত্ব, তাঁহার দীক্ষাতত্ত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের গুপ্তদীক্ষাতত্ত্বের তুলনা ও গবেষণা, এবং তাঁহার কৃতী শিষ্যগণ সম্বন্ধে আলোচনা এই সকল লইয়া আমরা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বুঝতে পারি। তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ব্যাখ্যা ও তাঁহার দীক্ষা এই তিনটীই তাঁহার জগৎকে দান, স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটীকে বুঝিতে হইবে।

সমাপ্ত

যোগিরাজস্মৃতি, তৃতীয় লহর, প্রথম খণ্ড

পত্রাবলী

তে

ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান

যোগাবতার যোগিরাজ —

শ্রীশ্রী ১০৮ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

মহাশয়ের সহিত শিষ্যদিগের সাধন সংক্রান্ত

কয়েকটি পত্র ও পত্রাংশ।

শ্রী শ্রী যোগিরাজের ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক জীবনী প্রভৃতির

— প্রণেতা —

শ্রী শ্রী যোগিরাজপৌত্র, আচার্য্য, ব্রহ্মচারী,

শ্রী আনন্দ মোহন লাহিড়ী,

— সঙ্কলিত —

ভূমিকা।

ভারতবর্ষ মুনিঋষিদের তপস্যার স্থান। মুনিঋষিদের তপস্যা লইয়া ভারত চিরকাল গৌরবান্বিত। আজও আমরা একজন ঋষির কথাই বলিব। যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ভারতের সাধনাক্ষেত্রে একটী ধ্রুবতারা। পথভ্রষ্ট নাবিক যেমন ধ্রুবতারার সাহায্যে আপনার পথ ঠিক করিয়া লয় অসংখ্য সাধকও তেমনি তাঁহার আদর্শ দেখিয়া নিজেদের সাধনপথ ঠিক করিয়া লইয়াছেন। সাধনক্ষেত্রে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি।

এই মহাপুরুষের প্রদর্শিত সাধন পথের নাম ছিল "ক্রিয়া" এবং সাধকদের তিনি "ক্রিয়াবান্" বলিতেন। সাধনা ও সাধক অর্থে যথাক্রমে ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এই দুইটী কথার প্রয়োগ নূতন না হইলেও উহাদের ঐরূপ প্রয়োগ প্রায় বিরল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু যোগাবতার যোগিরাজের শিষ্যদের মধ্যে ঐ দুইটী কথার প্রয়োগ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা তাঁহাকে যোগিরাজ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিলেও কেহ যেন তাঁহাকে কাঠখোট্টা হঠযোগী বা কসরৎওয়ালা মনে না করেন। তিনি ছিলেন রাজযোগী, তিনি ছিলেন পরম ভক্ত, প্রেমিক, ভক্তরাজ আবার তিনি পরম বৈদান্তিক, পরম জ্ঞানী। তাঁহাকে কতকগুলি বিশেষণ দিয়া আমরা তাঁহার এক একটা দিক দেখিতে পারি বটে কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সম্পূর্ণ আভাস দিতে পারি না। অনেকে তাঁহাকে দয়াল ঠাকুর দয়ার সাগর বলিতেন। এত স্থির, প্রশান্ত, অগাধ প্রেমের আধার, যোগীশ্বর, ঈশ্বর পুরুষকে ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা অসাধ্য। অগাধ অসীম সমুদ্রকে বুঝিতে হইলে সমুদ্রের নিকটেই যাইতে হয়, কেবল মাত্র অপরকে দিয়া এক ঘটী সমুদ্রের লবানাক্ত জল আনাইয়া চিরকাল সমুদ্র হইতে বহুদূরে কোন স্থানে বসিয়া সেই ঘটীর জল দেখিয়া যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে

কোন ধারণাই হয় না সেইরূপ এই মহাপুরুষকে বুঝিতে হইলে তাঁহার অনুভূতিকেও তাঁহার অসীম সত্তাকে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে হইবে, তাঁহাকে তাঁহার স্বস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেরদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আনিলে চলিবে না।

তাঁহার ছাব্বিশখানি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, তাঁহার অসংখ্য পত্র, তাঁহার সাধনা, তাঁহার চরিতকথা, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা এই সকলের মধ্যে আমরা তাঁহার একটা আভাস পাই। এত স্থির, এত ধীর, এত দৃঢ়, এত শান্ত প্রেমিক সাধককে কেবল নিজের চোখে দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, বোধ হয় তাঁহাকে পূর্ণভাবে দেখাও হয় না। মাত্র দুইটী চোখে আর কতটুকু দেখা যায় তাই আমি তাঁহাকে শত সহস্র লক্ষ্যভেদী চোখের ভিতর দিয়া দেখিতে চাহিয়াছি। যত লোক তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকে কি.চোখে তাঁহাকে দেখিয়াছে তাহাই সংগ্রহ করে করে যদি আমি তাঁহাকে দেখি তবে কি সে দেখা যে কোন দুটী চোখের চাক্ষুষ দেখার চেয়ে সত্যকার পূর্ণভাবে দেখা হইবে না?

আমরা ক্রমশঃ যোগিরাজের লিখিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাবলী প্রকাশিত করিতেছি। তাঁহার ব্যাখ্যাত মনুরহস্য ক্রিয়াবানদের নিত্য পাঠ্য। আমরা মনুরহস্য পুনঃ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছি। এই পুস্তকে ক্রিয়াবানেরা তাঁহার গভীর অনুভূতির ও উচ্চাবস্থার পরিচয় পাইবেন। তাঁহাকে ভালভাবে বুঝিতে যাইয়া সবচেয়ে উপকৃত হইব আমি আর যাঁহারা আমার মত বুঝিতে চাহেন তাঁহারাও হয়ত উপকৃত হইবেন। এই উপকারের আশায় আমরা তাঁহার কতকগুলি পত্রের সারাংশ উপস্থিত করিয়াছি। ঐ গলিত পত্রগুলির এমন অবস্থা যে আর কিছুদিন পরে তাহাদের আর অস্তিত্বই থাকিবে না। ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানদের কথায় ঐ সব পত্র পরিপূর্ণ। পাতঞ্জল দর্শন যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সাধনপাদের প্রথম সূত্রেই ক্রিয়াযোগঃ কথাটী আছে। আর কায়ব্যূহ জ্ঞানের কথাও ঐ শাস্ত্রে আছে। শরীরের যে জালের মধ্যে আমরা আটকাইয়া পড়িয়াছি উহাই কায়ব্যূহ, ইহার যে পাঁচটা কোষ আছে

তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় "ক্রিয়া"। হিন্দুর এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহাতে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মুদ্রা প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান নাই অথচ এই সব ঠিক মত করিতে হইলে "ক্রিয়া" কি তাহা জানা চাই। কিন্তু কোন কোন কুকুর যেমন অপরিচিত কোন জীবকে দেখিলেই ক্ষেপিয়া ঘৌ ঘৌ করিয়া উঠে আমরাও তেমনি নিজেদের অপরিচিত সাধনরাজ্যের কোন কথা শুনিলেই ভয়ে চিন্তায় উদ্বেগে অস্থির হইয়া উঠি। সুখের বিষয় এই যে আজ ভারতে ক্রিয়াবান্ সাধকের সংখ্যা বড় কম নহে এবং তাঁহাদের জন্যই পত্রে ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানদের কথা লেখা। যাঁহার কৃপায় এই ক্রিয়ার এত সুপ্রচার তাঁহার স্বতন্ত্র জীবনী থাকিলেও কোন বন্ধুর অনুরোধে আমরা সেই যোগাবতার যোগিরাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের ঘুরণি গ্রামে বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গৌরমোহন লাহিড়ী সরকারের পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী সরকার। ইঁহার মাতার নাম মুক্তকেশী। ইঁহার জন্মস্থান এখন প্রায় জলাঙ্গী নদীর গর্ভে। ঐ নদীর অপর নাম খড়ে। ইনি (ইংরাজী ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাব্দ) ১২৩৫ সালে অপর পক্ষের সপ্তমীতিথিতে ঘুরণিতে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ৬৭ বৎসর পূর্ণ হইয়া পনেরটী তিথি পার হইয়া যায়, সেই হিসাবে তখন তাঁহার বয়স ৬৮ বলা চলে। তাঁহার ভক্তগণ দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন মহাষ্টমীর পর বলিদানের সন্ধিক্ষণে তাঁহার তিরোভাবকাল উপলক্ষে সর্ব্বত্র উৎসব, ধ্যান ও পূজাদি করিয়া থাকেন। ইঁহার পিতা পরমযোগী ছিলেন এবং যোগস্থ হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। বাল্যকালেই শিশু শ্যামাচরণ পিতার সহিত নানা কারণে কাশীবাস করেন এবং আজীবন সেইখানেই নিবাস স্থাপন করেন। পিতার ন্যায় এই বালকও আশৈশব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ উপনয়নের পর নিত্য বেদ পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতে পাইতেন না। নাগভট্ট নামক পণ্ডিত তাঁহাকে বেদ পাঠ করাইতেন। তিনি বয়সের সহিত

ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসিক প্রভৃতি কাশীতে প্রচলিত ভাষায় যথেষ্ট দখল লাভ করেন এবং তাৎকালীন স্কুলের ইংরাজী শিক্ষাও সমাপ্ত করেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দেবনারায়ণ বাচস্পতির কন্যার সহিত ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ বড় নির্ব্বিবাদী পুরুষ ছিলেন। তিনি পৈত্রিক বিষয়ের কোন অংশ না লইয়া নিজে সরকারী সামরিক পূর্ত্ত(ইন্‌জিনিয়ারিং) বিভাগের কেরাণী হইয়া সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তিনি চিরকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা অর্জন করিয়াছেন তাহাতেই সংসার পালন করিয়া যথাসাধ্য গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন। তাঁহার দানের বিষয় কচিৎ কেহ জানিতে পারিত। অতি গুপ্ত ও নানা কৌশলে তিনি অপরের সাহায্য করিতেন। তাঁহাদ্বারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি নানা জনহিতকর কর্ম্ম ঘটিয়াছে। এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে তিনিই হিন্দী ও বাংলাতে ক্ষুদ্রাকার অসংখ্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা বিনামূল্যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতে এই গীতা প্রচারের সূচনা হয় এবং তখন তিনি দীক্ষিতও হন নাই। লক্ষাধিক গীতা তিনি প্রচার করিয়াছেন এইরূপ বিশ্বাসের হেতু ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে গীতা প্রচার ও গীতার আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার তাঁহার শ্রেষ্ঠদান। তিনি চাকরি করিতে করিতে আলমোরার রাণীখেত অঞ্চলে দ্বারাহাটে গমন করেন এবং সেখান হইতে পাণ্ডুখুলি ভট্‌কোট রেনজের গুহায় সহসা সৎগুরুলাভ করেন। তাঁহার দীক্ষার সময়ে ঐ অঞ্চল নৈনিতাল জেলার অন্তর্গত ছিল। যে মহাপুরুষের নিকট তিনি দীক্ষা পাইলেন তাঁহাকে ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ বলা চলে। ইঁহাকে তিনি বাবাজী বলিতেন। গুরুর হুকুমে তিনি গৃহস্থাশ্রমেই ছিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ ও যোগশাস্ত্রের সমস্ত চরম অবস্থা তিনি লাভ করেন। পরে ইনি বহু লোককে দীক্ষা দান করেন। তিনি কোন

শিষ্যের কোনরূপ দান গ্রহণ পছন্দ করিতেন না এবং কেহ কিছু দিলেও বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান কখনো কখনো করিতেন। দীক্ষার টাকা পাহাড়ী সাধু বাবাজীকে হিমালয়ে প্রেরণ করিতেন। দীক্ষার সময় অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত জন্য পাঁচ টাকা মাত্র লইবার নিয়ম থাকে। অন্য কোনরূপ প্রণামী লইবার রীতি ছিল না এবং কাহাকেও তিনি পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। অন্যান্য গুরুর নিকট দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে কোন লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা লইত এবং তাহাতে অন্যগুরু দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তির সাধনার পুষ্টিই হইত কারণ সকল সাধনাতেই ঈশ্বর প্রণিধানের জন্য ক্রিয়াযোগ পুষ্টিকর। তিনি শেষ জীবনে পেনসন লইয়া ও আরও কয়েকটী বাড়ী লইয়া তাহা ভাড়া দিয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে নানা গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া ক্রিয়াবানদের মধ্যে বিতরণ করেন। ইহা তাঁহার ভারতের সংস্কৃতি এক অপূর্ব্ব দান। ভারতের সাহিত্যে এই দানের গৌরব এখনও সুরক্ষিত হয় নাই। তিনি এক নূতন ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা ভারতের বাহিরেও জগৎকে প্লাবিত করিতেছে। তাঁহার আদর্শে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আরও পনের ষোল জন অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহার জীবন অসংখ্য অলৌকিক সত্যঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি ভক্তিযোগ ও বেদান্ত জ্ঞানের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহারই প্রদত্ত ক্রিয়ানামক গুপ্ত সাধন রহস্য সংক্রান্ত পত্রাবলী আমরা যোগিরাজ স্মৃতির তৃতীয় ধারায় নানা খণ্ডে ক্রিয়াবানদের হস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিব। ভগবৎকৃপায় আমাদের এই চেষ্টা জয়যুক্ত হউক। যোগিরাজ স্মৃতির প্রথম ধারায় তাঁহার অলৌকিক জীবনী নানা খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল ধরিয়া এই মহাপুরুষের বিষয়ে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহিত হইয়াছে তাহার ক্ষুদ্র তালিকা দেওয়াও এ স্থলে সম্ভব নহে।

ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা ভাবিয়া একস্থানে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন " এ কলিকালে গোপন করিতে করিতে একেবারে গুহ্য বস্তু হইয়া

গিয়াছে। এই অতি গোপন ভাবও অন্যায় তাই সাহস করিয়া তাঁহার বিষয়ে আমরা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার কতকগুলি বিশিষ্ট বাণী আমরা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করিয়া দিলাম।

অলমতিবিস্তরেণ।

ইতি - গ্রন্থাকার -

যোগিরাজস্মৃতিধারা, ৩য় লহর, ১ম খন্ড।

পত্রাবলী

তে

ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্

যোগাবতার যোগিরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচারিত সাধণপথ ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ সংক্রান্ত পত্রাবলী।

সূচনা ঃ

" তাঁহাতেই সমস্ত প্রকাশ হয়। তিনি না থাকিলে কিছুরই প্রকাশ হয় না। তাঁহারই দ্বারা সমস্ত প্রকাশ হয়।" - যোগিরাজ।

পরাৎপর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে এই পত্রাবলী যথাসময়ে লিখিত ও প্রকাশিত হইল।

যাঁহারা ক্রিয়াবান্ সাধক কেবলমাত্র তাঁহাদের এই পত্রাবলী পাঠে আগ্রহ হইতে পারে কারণ অন্যে ইহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন না। ক্রিয়াবান্ সাধকদের জন্যই ইহা যত্ন করিয়া মুদ্রিত করা হইল। প্রথম খন্ডে অতি অল্প সংখ্যক পত্র প্রকাশিত

করা হইল, অপরাপর খণ্ডে অন্যান্য পত্র প্রকাশিত করা হইবে। যে সকল পত্র গলিত প্রায় তাহাই সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হইল। অনুরোধ-বশতঃ কতকগুলি পত্রের নাম ধাম দেওয়া হইল না। মাত্র কয়েকটী পত্রে পত্রদাতার নাম ধাম দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রেই গুরু ও শিষ্যের লেখা একত্রে পাওয়া যায়। যোগিরাজের নিয়ম ছিল যে যিনি পত্র দিবেন তিনি পত্রের অর্দ্ধেক স্থান উত্তর জন্য ছাড়িয়া রাখিবেন এবং পত্রের উত্তর পাইবার জন্য ডাক টিকিট পাঠাইবেন। যোগিরাজ এক, দুই, ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা প্রশ্ন সকলকে স্বয়ং চিহ্নিত করিয়া পত্রের ছাড়া স্থানে উত্তর দিয়া কোন্‌টী কোন্ প্রশ্নের উত্তর তাহা চিহ্নিত করিয়া সমস্ত পত্রই পত্রলেখককে ফেরৎ দিতেন। কাজেই যে সকল পত্রলেখক আমাদিগকে পত্রগুলি দিয়াছেন তাহারই অংশ আমরা প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ক্রিয়াবান্ তাঁহাদের অনেকেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে কে বা কাহার এই সকল পত্রের লেখক। পরমপরাৎপর পরমগুরুদেবের নিজস্ব বা তাঁহার অগ্রগণ্য শিষ্যদের বাছাই করা সাধারণ কয়েকখানি পত্র আমরা ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়াবান্‌দের নিকট উপস্থিত করিব। যাঁহারা নিয়মিত সাধনভজন অর্থাৎ ক্রিয়া করেন না তাঁহারা এই সকল পত্রের অনধিকারী সুতরাং তাঁহারা যেন অনধিকার চর্চ্চা করিয়া নিজের এবং অন্যের ক্ষতি না করেন। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা যথাস্থানে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইবেন।

পত্রাবলী।

প্রকাশিত পত্রগুলির মূল পত্র বিভিন্ন স্থানে এবং রাঁচিতে সযত্নে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আছে। যে স্থলে তিন চারিখানি বা বহু মূলপত্রে একই ধারার লেখা দেখিতে পাওয়া যায় সে স্থলে আমরা একটী মাত্র মূলপত্রের নকল নমুনারূপে ছাপাইয়াছি। বিশেষ অধিকারবশতঃই আমরা এই পত্র সকল প্রকাশ করিলাম। আমাদের বিনা অনুমতিতে এই সকল পত্র অন্যের প্রকাশিত বা ভাষান্তরিত করিবার অধিকার নাই। গণ্যমান্যদের অনুরোধে সত্যরক্ষার্থে মাত্র কয়েকটী মূল পত্রের ছায়াচিত্র (হাফটোন বা লাইন ব্লক) ও নাম ধাম প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

উদ্দেশ্য - কয়েকজন সাধক ক্রিয়াবান্‌দের কল্যাণার্থে যে সকল পত্র লিখিত তাহাতে আরও দশ জনের কল্যাণ হউক।

ভগবৎকৃপা ও ক্রিয়াবন্‌দের আগ্রহ থাকিলে অন্যান্য অসংখ্য মূলপত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ বিবিধ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সাধনায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। কি ভাবে ক্রিয়াবন্ সংসারে নিজের জীবনকে চালাইবেন, সাধনকালে আহার, বিহার, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল বিষয়ে সৎগুরুর নানা ইঙ্গিতে ও উপদেশে এই সকল পত্র পূর্ণ। পূর্ব্বে মাত্র কয়েকজন ক্রিয়াবান্‌দের মধ্যে ইহা আদরের জিনিষ ছিল - এখন ইহা সকলের যত্নের জিনিষ হইবে, কারণ ইহার ভিত্তি মূল প্রামাণিক পত্রগুলির উপর। যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ সকল পত্র প্রদর্শন করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। পত্রগুলির উপলক্ষে যাঁহাকে ক্রিয়াবান্‌দের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া মানি সেই যোগাবতার

পত্রাবলী।

যোগীরাজ শ্রীশ্রী ১০৮ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয়ে যাঁহারা সবিশেষে জানিতে চাহেন তাঁহারা মৎপ্রকাশিত যোগিরাজের প্রামাণিক জীবনী ও অন্যান্য রচনা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন একথা বলা বহুল্য।

কত ভাবের কত গুপ্ত রহস্যই এই সকল পত্রে দেখিতে পাই তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরমগুরুদেবের ঐতিহাসিক, বিশুদ্ধ, প্রামাণিক, এবং চাক্ষুষ উপদেশ সংগ্রহ বিষয়ে এই পত্রগুলি অদ্বিতীয় এই কথা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।

রহস্যপূর্ণ অধিকতর মূল্যবান্ তথ্য যে সকল পত্রে আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে কিনা এবং প্রকাশিত হইলেও তাহা বিশিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য তালিকাভুক্ত লোক ভিন্ন অপরকে বা জনসাধারণকে উহা দেওয়া যাইবে কিনা ইহা এখনও বিচারাধীন। তবে ঐ সকল পত্র ও উপদেশ এমনভাবে লিখিত যে অনধিকারী ঐ সকল পাঠে কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন কিন্তু কেবলমাত্র পুস্তক পাঠে নিজের কোন উপকার লাভ করিতে পারিবেন না। পথের পথিক হইলে তাঁহার ন্যায্য দাবী ঐ সকল পত্রে কতকাংশে প্রকৃতই পূরণ হইবে। যে সকল পত্র প্রকাশিত করিলে অন্যের প্রতারক কপটগুরু সাজিবার সুবিধা তাহা প্রকাশ করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নাই এবং তাহা উচিতও নহে।

প্রত্যেকটী পত্রে কল্পনা অনুমান বা অতিরঞ্জিত কোন কথাই নাই। ইহার সকল কথাই মূল পত্রানুসারে সত্যদ্রষ্টার অনুভূতির

কথা। যিনি যেরূপ আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নত তিনি ইহাতে সেইরূপ রহস্যের প্রকাশই দেখিতে পাইবেন। যাঁহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত তাঁহাদের নিকট আমরা আনুগত্য প্রণতি ও বন্দনা জানাইতেছি।

ইতি—

শ্রীশ্রীযোগীরাজপৌত্র ক্রিয়াবান্ সেবক

শ্রী আনন্দ মোহন লাহিড়ী

খৃষ্টাব্দ - ১৯৩৮

(রাঁচি)

পত্রাবলীর অন্যান্য খন্ডের আলোচ্য বিষয়ের আংশিক পরিচয়ঃ—

যোগীরাজ স্বয়ং পত্রে যে সকল সমস্যার বা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তাহারই একটী ক্ষুদ্রতম তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) ক্রিয়ার তৃপ্তি পাইবার উপায়। (২) সংশয়ের ফল। (৩) ধাতুগতবিষমজ্বরের চিকিৎসা। (৪) ভালরূপ ক্রিয়া করিতে না পারিলে কর্ত্তব্য। (৫) স্ত্রীসমন্বিতপুরুষের পক্ষে সাধনাদির সীমা ও সংখ্যা এবং বিধিব্যবস্থা। (৬) ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। (৭) দেহ নিরাময় নয়, চিত্তও নির্ভরশীল নয়, এরূপস্থলে উপায়। (৮) সংশয় নিবারণের

উপায়। (৯) মৃতবৎসার সন্তানের নাড়ীছেদন বিধি।(১০) ভোজনে বিধিনিষেধ।(১১) বিনাশকর সংশয় কি. এবং তাহা নিবারণের উপায়।(১২) স্নানের ব্যবস্থা।(১৩) ক্রিয়ার সুলক্ষণ। (১৪) বিধবার দীক্ষাকালে প্রায়শ্চিত্তবিধান। (১৫) অনুভূতির কথা কাহাকে বলা নির্দ্দোষ। (১৬) গুরুমহিমা শ্রবণের পাত্রাপাত্র।(১৭) কুটিল উদরবায়ু এবং শুক্রতারল্য ও ক্ষয়ের সহজ ঔষধ ও ব্যবস্থা।(১৮) ক্রিয়ার নিত্য এবং অনিত্য দুইপ্রকার সুলক্ষণ।(১৯) নানা রোগের নানা ঔষধ।(২০) ভক্তিসুখানুভবের উপায়।(২১) কর্ত্তা বা গুরু কে. এইরূপ অসংখ্য সমস্যার প্রতি যোগিরাজের লিখিত সদুত্তর আছে। এতদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি মূল পত্রের অবিকল ছায়াচিত্র প্রকাশিত করা হইবে।

অলমতিবিস্তরেণ।

ইতি — গ্রন্থাকার

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে। কলিকাতা।

শ্রীচরণেষু। ৫২ চাঁপাতলা প্রথম গলী।

ভূমিসাৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনমিদং ২ নভেম্বর। ১৮৮৮

১। মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে নির্বিঘ্নে বাটী পৌঁছিয়াছি।

২। স্ত্রীর সহিত ঘর হইতে ৫৲ পাইয়া ক্রিয়া দিয়াছি। টাকা তাহার নিকট মজুদ আছে। এইবার বাটী যাইলে সঙ্গে আনিব ও পাঠাইব। নাম — রমণী সুন্দরী দেবী।

৩। ক্রিয়া দান কালে নক্ষত্র দর্শন হইয়াছিল এবং মহাশয়ের কৃপায় ২।৩ দিন পরে কূটস্থে উদিত সূর্য্য দর্শন হয়।

৪। মহাশয়ের নিকট হইতে আসার পর কূটস্থে প্রসারিত এক খানি চরণ দৃষ্ট হয়। চরণের নিম্ন আরক্তিম উপরের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ।

৫। আর একদিন একটী মাতৃদর্শন হয়। তিনি শ্যামা-মনস্থ মুখলোম কৃষ্ণ বর্ণ।

৬। বাটীতে ৺কাত্যায়নী পূজা উপলক্ষে কয়েক দিন ক্রিয়া করিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন আবার ক্রিয়ার উন্নতির চেষ্টায় রত হইলাম।

৭। যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মহাশয় সর্ব্বান্তর্যামী আর কি জানাইব।

ইতি শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।

ভক্তাবনতস্য চিরকিঙ্করস্য

শ্রীরামঃ গ্রাহি শর্ম্মণঃ।

মন্তব্যঃ- উক্ত পত্র শ্রীশ্রীযোগিরাজকে পোষ্টকার্ডে লিখিত পত্রের ছায়াচিত্র। রামগ্রাহিবাবু গ্রন্থকারের পরিচিত। শ্রীশ্রী গুরুদেব ইঁহাকে একটী রেশমের রুমাল দেন, তাহাই স্ত্রীর মাথায় রাখিয়া স্বামীই স্ত্রীকে অনুমতিক্রমে দীক্ষা দেন। দীক্ষার ব্যবস্থা ও সাধকের নিজের ও তাঁহার স্ত্রীর পরিষ্কার দিব্যদৃষ্টির যৎসামান্য পরিচয় এই পত্রে লক্ষ্য করা যায়। লোকে যাতায়াত প্রভৃতিতে কোনরূপে অসুবিধা ভোগ না করে এ বিষয়েও তাঁহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল, এই জন্য তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা দিতেন, ইহাতে ক্রিয়ার কোন পার্থক্য ঘটিত না।

পত্রাবলীতে

তে

ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান

১

ওঁ নমঃ শ্রী গুরবে নমঃ ।

শিষ্য ঃ— ভগবন ।

XXX৫ । বিষ্ণুপুরে যাহারা চতুর্থ ক্রিয়া করেন তাঁহারা টানিয়া নামাইয়া তারপর চতুর্থ করেন, আমি দোকড়ী বাবুর উপদেশ মত তুলিয়া কূটস্থে আটকাইয়া করি, কোনরূপ প্রশস্থ ?

XXX দাসানুদাস—

শ্রীকৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোবাধ্যায় ।

সোনামুখী ১২৯৬ । ২৯ জৈষ্ঠ ।

শ্রীগুরু ঃ— দুই ভাল । শ্রী শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণঃ ।

(মূল পান্ডুলিপি ৪০ নং ১৩০ পৃষ্ঠা ।)

১। মুণিবর শ্রীশ্রী দুকড়ী লাহিড়ী মহাশয় যোগাবতার যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের কণিষ্ঠ পুত্র। ইনি আজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজ গুপ্তজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যোগীরাজ একদিন ইহাকে বলেন, "তোমার জন্য যাহা করিয়া

দিলাম তাহাতে তোমার অন্নবস্ত্রের চিন্তা কোন দিন করিতে হইবে না।আপন ভাবে মগ্ন থাকায় লোকে কিছু দিন তোমাকে উন্মাদ মনে করিবে, কিন্তু তুমি অন্তরে স্থির থাকিবে। তোমাকে কিছু ভাবনা চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি কেবল সারাজীবন বসিয়া বসিয়া ক্রিয়া করিবে এবং সমস্ত অবস্থা লাভ করিয়া শান্ত থাকিবে।" শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীর দিব্যোন্মাদ অবস্থাকে কেহ কেহ রোগ বিবেচনা করিয়া উহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য যোগিরাজের নিকট আবেদন নিবেদন করিলে তিনি উপেক্ষা করিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন। কখনো বা বলিতেন "কতজনের কত করিব, দুনিয়ায়ত কতই রয়েছে, ঐটাকেই কি কেবল আমার সন্তান দেখিয়াছ?" এই সব ব্যাপর দেখিয়া শুনিয়া যোগিরাজকে তাঁহার বিষয়ে উদাসীন মনে করিয়া নানা জনে তাঁহার নানা ব্যবস্থা করিতেন। একবার শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী দয়াবশতঃ কতকগুলি ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করায় তাঁহার ঐরূপ দিব্য অবস্থার রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সে সকল ব্যাপার আমারা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বাঁকুড়া জেলায় এবং বিষ্ণুপুর বহু ক্রিয়াবান্ শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কালক্রমে সাধনায় উচ্চাসন লাভ করিয়া বহুলোকের গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন। শ্রীকৈলাস চন্দ্র, আচার্য্য শ্রীকান্তিচন্দ্র, আচার্য শ্রীরামরূপ প্রভৃতি অনেকে শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীর নিকট যোগিরাজের নির্দ্দেশক্রমে উচ্চ সাধনা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সব শিক্ষা যে যোগিরাজ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল এইরূপ বহুপ্রমাণ

ও পত্রাদি দেখা যায়। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী প্রত্যেক ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা প্রকার ভেদ এবং কিরূপ পাত্রে কোন ক্রিয়া কি উদ্দেশ্যে কি ভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাও জানিতেন। কিজন্য কি করিতে হইবে এবং কিরূপ লোক, কখন, কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন এই ব্যাপার লইয়া শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী আমার সাক্ষাতে তিন মাসকাল প্রত্যহ পূজ্যপাদ মহাবীর স্বামীর সহিত কলিকাতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। আমার জীবনে ইহা এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। যোগিরাজের স্বহস্তলিখিত এক গোপনীয় খাতায় ক্রম অনুসাবে ১০৮ প্রকার ক্রিয়া, তাহার প্রকার ভেদ এবং পাত্রভেদে উহাদের প্রয়োগবিধির বিষয় দেখ যায়। ঐ খাতা শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীর নিকট ছিল। ঐ খাতা এখনও সুরক্ষিত আছে। ঐ খাতার একটী নকল আচার্য্য শ্রীশ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্বহস্তে টুকিয়া লইয়াছিলেন এইরূপ মন্তব্যও সেই খাতার শেষে লেখা আছে। মূলতঃ প্রধান ক্রিয়া চারিটী মাত্র এই কথাও উহাতে আছে। শ্রীশ্রীযোগিরাজ লিখিত ও মৎপ্রকাশিত মনুরহস্য প্রথম অধ্যায় ৮১ শ্লোকের রহস্যব্যাখ্যাতেও এই কথা লিখিত আছে। শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীতিনকড়ি লাহিড়ী। শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী দিবারাত্র নিজ পিতা যোগিরাজের সহিত একত্র বসবাস ও সর্ব্বদা আলাপ করিবার যে সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন এমন আর কেহ পান নাই। সর্ব্বদা সাধনার জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট কৌশলও তিনি উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগিরাজের

নির্দ্দেশ মত তিনি সর্ব্বদাই সাধনাতে রত থাকিতেন ও যোগারূঢ় অবস্থায় সময় কাটাইতেন। সারারাত্রি প্রায় শয়ন করিতেন না কেবল সাধনাতেই থাকিতে, কখন কখন তিনি মধ্যরাত্রে অশরীরীদের সহিত আলাপ করিতেন, এবং আমি অবিশ্বাস করায় তিনি করুণা করিয়া আমার বিশ্বাসের জন্য ঐ সব বিষয়ে বহু ব্যাপার একবার আমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। যোগশাস্ত্র মতে নাড়ি দেখিয়া কে কত কাল জীবিত থাকিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন, এমন কি কত ঘন্টা ও মিনিট পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া কঠিন রোগীর মৃত্যুকাল বলিতে দেখিয়াছি। তিনি যখন যাহা ভবিষ্যৎবাণী করিতেন তাহার একটীও বিফল হইতে দেখি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টাকা রোজগারের জন্য বিদেশে বিদেশে যখন চাকরিতে ছিলেন সেই সময় যোগিরাজের বিশেষ বিশেষ গুপ্ত চিঠিপত্র এবং ক্রিয়ার বহু গুপ্ত কাগজপত্র আমার সদাশিব পিতৃদেব শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীই একটা বাক্সে রাখিতেন। ঐ সকল কাগজপত্র তিনি কখনও হাতছাড়া করিতেন না। যোগিরাজ নিজের লিখিত ও অঙ্কিত বহু কাগজ পত্র ঐ বাক্সে বাবাকে রাখিতে দিতেন এবং বলিতেন "ঐ সকল তোমার কাজে লাগিবে।" এই বাক্স পিতৃদেব আমাকে দেন। বাবা ক্রিয়াবান্ সিদ্ধযোগী মহাবীর স্বামীকে আমার সাক্ষাতে বহু বিষয় বুঝাইয়া "ক্রিয়ায় খাতাটী" নকল করিতে দেন। মহাবীর স্বামীর ন্যায় শক্তিসম্পন্ন সাধকের এই কার্য্যটী আমার বিচার বুদ্ধির অতীত মনে হয়। "ঐ ক্রিয়ার খাতাতে"

বিজ্ঞান কোষের বহু রেখা চিত্র আছে। কোন রেখা পথে কি ভাবে মনের স্থিতিতে বা গতিতে কি ফল হইবে তাহাও ঐ খাতায় লেখা আছে এবং তাহার কার্য্যকারণও স্পষ্ট দেখান হইয়াছে। ঐ খাতা রাণীক্ষেতে দ্বারাহাটের পারে তাম্বুতে থাকিবার কালে যোগিরাজ দীক্ষাস্থানে বসিয়া লেখেন এ বিষয়ে একস্থানে স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া আছে। যোগিরাজ নিজগুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ খাতা লিখিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

১৩১৯ সালের পর একনিষ্ঠ সাধক " নীলু পীয়ন" যখন শ্রীতিনকড়ি লাহিড়ীর নিকটে তৃতীয় ক্রিয়ার বিষয় প্রশ্ন করেন তখন তিনি প্রত্যুত্তরে লেখেন "তোমার দুইকড়ি দাদার সাক্ষাতে গোল মিটিবে। দুই জনাই আনন্দ পাইবেন। কৈলাস বাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন।" নীলুর এইরূপ বহু পত্র তিনি নিজেই আমাকে দিয়াছিলেন।ইহা হইতেও বড় ভাই ছোট ভাইকে ক্রিয়ার ব্যাপারে কতটা এবং কেন এত প্রতিপত্তি দিতেন তাহা জানা যায়। নীলু আমার পিতাকে দোকড়ি দাদাই বলিতেন।

মহাবীর স্বামী কে? মহাবীর স্বামী একজন মানস সরোবরের কঠোর তপস্বী ক্রিয়াবান্। ইহাঁর কার্য্যকলাপ বড়ই রহস্যাবৃত চমকপ্রদ ও অলৌকিক। গ্রন্থান্তরে ইহাঁর কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল। কেহ কেহ বলেন ইনিই যোগিরাজের সহিত একত্রে দীক্ষিত দীনুকনেষ্টবল। কিন্তু ঐ ধারণা

ভুল, কারণ ইনি বাঙ্গালী এবং দীনু কনেষ্টবলও যোগিরাজের গুরুভাই নহেন, দীনু তাঁহারাই অনুগত শিষ্য।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার এক পত্রে শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী সম্বন্ধে যোগিরাজ কি কি বলিয়াছেন তাহার এক বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ, শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় কতকাল কি ভাবে এবং কেন ও কিরূপে অবস্থান করিবেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই এবং ঐ বিষয়ে যোগিরাজের ভবিষ্যৎ বাণীও পাওয়া যায়, ঐ ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে। মূল পত্রখানি সুরক্ষিত আছে, ঐ পত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কণিষ্ঠের প্রতি করুণাময় উচ্চ মনোভাব প্রকাশিত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে সে ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায় কারণ তিনি কণিষ্ঠের উপর কণিষ্ঠের শ্বশুর বৃদ্ধ শ্রীজয়রামের প্রভাব আদৌ পছন্দ করিতেন না। শেষোক্ত বিষয়েও কয়েক খানি প্রামাণিক পত্র আছে।

আধুনিক অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ মুনিবর শ্রীদুকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব না জানিয়া তাঁহার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন। যোগিরাজের শিষ্যগণের ও প্রতিনিধিগণের অগ্রগণ্য আচার্য্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে শ্রীদোকড়ি লাহিড়ীর ন্যায় ক্রিয়া আর কাহারও ভাল হইতে দেখা যায় নাই। সেইজন্য তৎসংক্রান্ত একটী পত্র প্রথমেই দেওয়া হইল। এই পত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই ক্রিয়ার প্রকারান্তর বা

বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ঐ সকল পদ্ধতি না জানিয়া কেহ যেন কাল্পনিক নূতন পদ্ধতির প্রচার না করেন কারণ তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে। যদি কেহ স্বাধীন নিজের অনুভূতির দায়িত্বে কিছু করেন সে বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য দেওয়া উচিত নহে। জগতে সকল আচার্য্যগণই স্ব স্ব অনুভূতি অনুসারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। গুরুকে মধ্যস্থ না করিয়া পরস্পরের সাধনায় তুলনা করা উচিত নহে। ইহাতে উপকৃত হওয়া ত দূরের কথা বরং একের সহিত অন্যের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিযা নানা সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। প্রথম পত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। আজকাল প্রায় সকলেই সাধনায় প্রকারান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র গুরুর স্মরণাপন্ন হইয়া মীমাংসা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

একই সম্প্রদায়ের পরস্পরের সাধনায় মিল না হইলে পরস্পরের গুরুকেও ভ্রান্ত মনে করা বিচিত্র নহে সুতারং যোগিরাজের প্রত্যুত্তর দেখিয়া এবং সমস্ত বিষয়টী বিচার করিয়া সাধকগণ সাবধান হইবেন। আজকাল এই জাতীয় বিভ্রাটই বেশী। সকলকে এই সমস্যাটি বুঝাইবার জন্য প্রথমেই এই পত্র প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত দুকড়ি লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথায় আমরা এই সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

অধিকাংশ সাধন সংক্রান্ত মূল প্রমাণিক কাগজপত্র আমি নানা কারণে নিজের অধিকারের বাহিরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সকল প্রদর্শিত

করিবার ব্যবস্থা করিতে আপত্তি ঘটিবে না। এই খন্ডের প্রকাশিত পত্র আমার নিজের নিকটে সুরক্ষিত আছে।

পত্রের অর্থঃ- যাঁহার চতুর্থ ক্রিয়া করেন তাঁহারা, টানা, নামিয়া তুলিয়া, কুটস্থে আটকাইয়া প্রভৃতি কথার অর্থ-ভালভাবেই জানেন বা গুরুর কাছে জানিবেন। ছাপা পুস্তকে এ সকল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

২

ওঁ গুরুবে নমঃ।

নমস্কারান্তরমিদম্ –

দোকড়ি দাদা, ক্রিয়ার উপদেশের টাকা পরম গুরুদেব বাবাজী মহাশয়কে দিয়াছি। আমার নমস্কার জানিবেন। আপনার উপদেশের টাকা আপনিই দিবেন।

শ্রীপঞ্চানন দেব শর্ম্মণঃ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট আর্য্যমিশন স্কুল হইতে আচার্য্য পন্ডিত শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত এই পত্র এবং ইহা যোগিরাজের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদুকড়ি লাহিড়ীর নিকট লিখিত।

পত্রাবলী প্রথম খন্ডে ২নং পত্রটীর সমস্ত অংশই প্রকাশিত করা হইল। দ্বিতীয় খন্ডে মূল পত্রের অবিকল ছায়াচিত্র ছাপাইবার ইচ্ছা রহিল। ঐতিহাসিক প্রমান হিসাবে এই মূল পত্র সুরক্ষিত আছে।

পত্রাবলী

ক্রিয়ার বা দীক্ষার টাকা বাবজী স্বয়ং লইতেন বা বাবাজীকে দিবার জন্য তদনুগত মহাবীর স্বামী লইয়া যাইতেন। বাবাজীর বিনা অনুমতিতে দীক্ষার টাকা কেহ খরচ বা হজম করিতেন না। ইহাই ছিল প্রথমকার নিয়ম।

এই বাবাজী কে? ইনিই যোগিরাজের গুরুদেব, রহস্যাবৃত কোন সিদ্ধপুরুষ মহাপুরুষ বা ঈশ্বরপুরুষ। ভবিষ্যতে ইঁহার কৃপা হইলে ইঁহার বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ লেখা যাইতে পারে। ২নং মুদ্রিত পত্রের মূল পত্রখানি আমারই হাত দিয়া আচার্য্য পন্ডিত পঞ্চানন ঠাকুর আমার পিতার নিকট পাঠান। ঐ পত্র তিনি নিভৃতে লেখেন, জরুরী গোপনীয় পত্র বলিয়া আমার হাতে দেন। সঙ্গে একটী চাকরকেও আমার সহিত দেন।

ঐ পত্র যেন আর কেহ না দেখে এবং বাবা যেন কাহারও সম্মুখে না খোলেন বা কাহারও সম্মুখে না পড়েন এবং দরজায় খিল দিয়া একা পড়েন, এতগুলি কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে বলিয়া দেন। অত গোপন করিবার কথা শুনিয়া আমি ঐ পত্র বিষয়ে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হই। ঐ পত্রটীকে বাবা যদি তাঁহার " উপদেশের পেটীতে " রাখেন, কালে উহা আমি দেখিতে পাইব এই দুষ্টু বুদ্ধি আমার মনে জাগে এবং সেই হিসাবে ঐ পত্রটীকে চিনিবার জন্য আমি চিহ্নিত করিয়া রাখি। ১৯১১ সালে ঐ ঘটনা ঘটে। আমি খামের উপর এক পাশে ও মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র ১৯১১ লিখিয়া উহা বাবাকে দিই। পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন কি না? পরে এইরূপ

প্রশ্ন করিয়া কৌশলে জানিয়া লই যে বাবা ঐ পত্র খামশুদ্ধ বাক্সে রাখিয়াছেন, ফেলিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করেন নাই। ঐ সময় আমার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নব উদ্দীপনায় আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করি, " দেওঘরের ঠাকুরমহাশয় আপনাকে কি লিখিয়াছেন ? " বাবা বিরক্ত হইয়া প্রথমতঃ নিরুত্তর থাকেন, অনেক পীড়াপীড়িতে কেবল বলেন , " বাবাজীর আশীর্ব্বাদ। " ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা এস্থলে আলোচ্য নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা " উপদেশের পেটী " আমাকে সমর্পণ করেন। শুনিয়াছি দেওঘরের ঠাকুর মহাশয়ের একটী " উপদেশের থলি " ছিল। বাবার দেহান্তের পর ঐ পেটীর মধ্য হইতে আমি সেই চিহ্নিত পত্রটী পাই। পেটীর মধ্যে দীক্ষার টাকা এই কথা লেখা একটী রেশমের রুমালে ৩৫টী টাকা এবং কতকগুলি লেখা কাগজ ছিল। যাহা হউক এই পত্র হইতে ইহাই দেখা যায় যে আচার্য্য পন্ডিত শ্রীপঞ্চানন ঠাকুর , আমার পিতা এবং যোগিরাজের গুরুদেব বাবাজীমহারাজের মধ্যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একটা আদান প্রদান চলিত এবং তাহার একটা লিখিত প্রমাণ রহিয়াছে। এমন কি সম্প্রতি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাবাজীমহারাজের দীক্ষার টাকা লইয়া যাওয়ার প্রমাণ পাইয়াছি। মহাপুরুষদের কৃপা হইলে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা অন্য কোন গ্রন্থে প্রকাশিত করা যাইবে। পিতাঠাকুর দীক্ষার টাকা বাবাজীকে দিবার জন্য দেওঘরের ঠাকুরকে কয়েকবার সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং বাবাজী টাকা লইয়া যান এই কথা আমি

পিতৃদেবের মুখে বহুবার শুনিয়াছি। দীক্ষার টাকা কি হইত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বাব্যর নিকট সর্ব্বপ্রথমে শুনিয়াছিলাম যে, একবার যোগিরাজ স্বয়ং গ্রীষ্মের দারুণ রৌদ্রে মধ্যাহ্নকালে বাটীর বাহিরে যাইতে ছিলেন, হাতে ছিল " উপদেশের থলিতে " টাকা , বাবা যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি এ রৌদ্রে কোথায় যাইবেন ? ইহাতে বাবা এই উত্তর পান যে যোগিরাজ বাবাজীকে টাকা দিতে এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোন নির্জ্জন প্রদেশে যাইবেন। যোগিরাজের সহিত বাবাজীর দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল বলেন যে কৃষ্ণরাম তাঁহাকে একবার ঐ বিষয়ে গোপনে একটী কথা বলিয়াছিলেন। সান্যাল মহাশয়ের ধারণা ঐ ব্যাপার হয়ত আর কেহ জানে না। যোগিরাজ স্বয়ং প্রতিবৎসর শিবচতুর্দ্দশীর পরদিন এক্কায় চড়িয়া সারনাথের ফাঁকা মাঠে যাইতেন, কোন কোন ক্ষেপে কৃষ্ণরাম এক্কায় কতকদূর যাইতেন, কিন্তু তাঁহাকেও খানিক দূর যাইয়া আর যাইতে দিতেন না, ইহাতে কৃষ্ণরাম অনুমান করিতেন যে ঐ সময় সম্ভবতঃ তিনি বাবাজীর নিকট যাইতেন। কোথায় কিজন্য কাহার নিকট যাইতেছেন ইহা তিনি কোন মতে প্রকাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীযোগিরাজ যে বাবাজীর সহিত সারনাথে মিলিত হন এই বিষয়ে এবং তাঁহার দীক্ষাস্থান সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র লেখা "উপদেশের পেটীতে " আমরা দেখিতে পাই, তাঁহা হইতে আমরা অনেক সত্যের মীমাংসা করিতে পারি। " দীক্ষাস্থান " নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার "ক্রিয়ারখাতা"তেও বাবজীর সহিত মিলনের কথা লেখা আছে। তাহা হইতেও দীক্ষাস্থানের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উহা হইতে দীক্ষাস্থানের সুনিশ্চিত ভৌগলিক অবস্থান নিরূপিত করা যায়।

পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপঞ্চানন ঠাকুরের বহু পত্রে দেখা যায় যে তিনি লিখিবার কালে বর্ণশুদ্ধির বিষয়ে মোটেই খেয়াল করিতেন না। মূল পত্রের "বাবাজি" স্থানে আমরা ছাপায় "বাবাজী" লিখিয়াছি, এজন্য ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয়।

(৩)

শ্রী গুরুর নিকট শিষ্যের নিবেদনঃ—

রাত্রে আজ্ঞামত গুরুপ্রণাম করিয়া বিছানাতে বালিসে হেলান দিবামাত্র অর্দ্ধ মিনিটের জন্য হঠাৎ উজ্জল শ্বেতবর্ণ একটী চন্দ্র আসে। X X X

তদপেক্ষা শ্বেতবর্ণের একটী চন্দ্র উদয় হইয়া দর্শন দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রায় আবেশ, ভাল হইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না, উঠিয়া বসিলাম মন ধড় ফড় করিতে লাগিল। X X X

চন্দ্রের যেরূপ গতি সেইরূপ মেঘে ঢাকা চন্দ্রের ন্যায় গোল শ্বেতবর্ণের একটী ছোট চন্দ্র দেখা যায় আর আর পূর্ব্বমত ।।৩ ।।

---

(৩) চন্দ্র দর্শনের ক্রিয়া দ্বারা বামে ইড়া নাড়িতে যখন প্রান ও মনের বিশেষ গতি, স্থিতি ও "বন্ধ"হয় তখনই ঐরূপ দর্শন

পত্রাবলী

(৪)

গুরুর নির্দ্দেশ ঃ—

আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিতেছি ক্রিয়া ঠিক মত ভাবে সব করিতে ৬০০ শত প্রাণায়াম ও মহামুদ্রা ৫০ ।।৪।।

(৫)

শ্রীগুরুর পত্রে —

আমার গত কল্য হইতে হঠাৎ জ্বর হইয়াছে X X X গুরুদেব তাঁহার কোন রোগীর ব্যাধি আমাকে দিলেন, ইহাতে রোগীর পরমায়ু বাড়িবে না কিন্তু শুভগতি হইবে ।। ৫।।

স্থায়ী হয়। "দিব্যদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয়শক্তি" নামক প্রবন্ধে এই বিষয় বিশেষ আলোচিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও হঠাৎ স্নায়বিক গতিদ্বারা সামান্য ক্রিয়াতে বা বিনা ক্রিয়াতেও ঐরূপ দর্শন ঘটে। ৩নং প্রামাণিক মূল পত্র কাচের উপর সংরক্ষিত আছে ।।৩।।

(৪) ইহা অতি উচ্চ অধিকারীর প্রতি হুকুম। কেহ যেন পুঁথি দেখিয়া প্রাণায়াম ও মহামুদ্রা শিখিতে না যান, উপযুক্ত গুরুর নিকট এই সকল শিক্ষা করিয়া নির্দ্দেশমত সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয় নচেৎ ক্ষতি ঘটে ।। ৪ ।।

(৫) জনৈক রোগী বেশ যুক্তিপূর্ণ আলাপ করিতে করিতে সজ্ঞানে যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি

(৬)

শিষ্যের পত্রে —

এখানে আসিয়া ২।৪ দিন পরে ১৭২৮ প্রাণায়াম আপনার আদেশ মত করিয়াছিলাম। বেলা আটটার সময় বসিয়া রাত্র আটটার সময় শেষ হইয়াছিল। একটু তাড়াতাড়ি হইয়াছিল ।।৬ ।।

নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। এইবার গুরুদেব সাক্ষাৎ হাজির, কেবল তাঁর নির্দ্দেশে শেষ কাজ করি বলিয়া রোগী তন্ময় হন। গুরুকৃপায় রোগীর ব্যাধির উপশম হইল এবং গুরু - কৃপাতেই শিষ্যের শুভগতি ঘটিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু মহাপুরুষের সহিত ইহার সাক্ষাৎ আলাপ ও দর্শন লাভ ঘটে। তাঁহার বিকার ছিল না ।। ৫ ।।

(৬) ১৭২৮ প্রাণায়াম সকলের বিধি নহে। যাঁহারা অন্ততঃ ৬ মাস ধরিয়া ২০০ প্রাণায়াম প্রত্যহ করেন তাঁহারাও ক্রমশঃ বাড়াইয়া ১৭২৮ কখনও কখনও করিবেন। ১৭২৮ এর উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ১০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারা যায় যদি সুস্থ ও সবল শরীর থাকে ও গুরুর নির্দ্দেশ পায়। এইকার্য্যে বার ঘণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন। বেলা ৮।৯ হতে রাত্র ৮।৯ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে হইলে আহারের একঘণ্টা পরে সূচনা বিধি। আহার কেবল ফলমূল বিধি। কিছু না খাইয়াও কেবল তৃষ্ণা হইলে কেবলমাত্র জল ও ঘৃত পান করিয়া একাসনে ১৭২৮ প্রাণায়াম করা চলে। একাসনে পা বদলান যায় ।। ৬ ।।

(৭)

শ্রীগুরু লিখিতেছেন –

বিবাহ্ করাতে আমি বিশেষ কিছু দোষ দেখিনা বরং করাই ভাল বোধকরি। ইচ্ছা হইলে বিবাহ করাই উচিত, না করাতে ব্যাভিচার হইতে পারে, তবে যদি আপনার অমত থাকে তাহা হইলে বিবাহ নাও করিতে পারেন ।। ৭ ।।

(৮)

শিষ্যের পত্র ঃ–

আমার জিহ্বা সকল সময়ে চেষ্টা করিলেও উপরে যায় না, প্রথমক্রিয়া শেষ হইলে পর হঠাৎ উপরে যায় এবং আপনার উপদেশ মত দ্বিতীয় ক্রিয়ার ২০০ পূর্ণ হইল। আমি আসনে বসিমাত্র চালাইবার কর্ত্তা আপনি ।। ৮ ।। গুরু, উত্তর - ভাল।

(৯)

শিষ্যের পত্রঃ–

চক্রে চক্রে জপ সাধ্য মত করিয়া যাইতেছি, সংপ্রতি কয়েক দিন হইতে দিবা ২ ।।০ ঘটিকার সময়ে বসিয়া রাত্র ৩ ।।০টা বা ৪টা পর্য্যন্ত বসি এবং প্রাতেও বসি। আপনি অন্তর্যামি ভগবান, সকলই জ্ঞাত আছেন। প্রাণায়াম দুইবারে ২০০ করিয়া ৪০০ এবং মহামুদ্রা বার করিয়া দুবারে চব্বিশ স্বতন্ত্র যা তাও করি ।। ৯ ।।

গুরু উত্তর ঃ– ভাল।

পত্রাবলী

(১০)

শ্রীগুরুর পত্রঃ–

রোগীর জন্য অনেকে ক্রিয়া লন পরে আরাম হলে বা না হলে কেহ কয়েক দিন পরে সব ছেড়ে দেন। ক্রিয়াতে যাদের আস্থা নাই তাদের ক্রিয়া দিবার ইচ্ছা নাই ।। ১০ ।।

(১১)

শ্রীগুরুর পত্র ঃ –

গরমের সময় ক্রিয়া কমই করিবেন। হাঁটুর বেদনার জন্য মহামুদ্রা যাহা পারেন তাহা করিবেন। উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ক্রিয়া দিতে পারি না ।। ১১ ।।

(১২)

শ্রীগুরুর পত্র ঃ –

কেহই কিছু করেনা সমস্ত ভগবান্ করেন, জীব উপলক্ষ মাত্র, সেই গুরু ভগবানে লক্ষ্য রাখিতে বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা করুন, ইহাতেই মঙ্গল ।। ১২ ।।

(১৩)

শ্রীগুরুর পত্র ঃ –

সকলকে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিতে বলিবেন ।। ১৩ ।।

(১৪)

শিষ্যের পত্র ঃ—

সাড়ে বার ঘন্টা বসিয়া ক্রিয়া শেষ করিয়া অভূতপূর্ব্ব

আনন্দ পাইয়াছি, আপনি অনেক বিভূতি দেখাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। আপনি সকলই জ্ঞাত আছেন ।। ১৪ ।।

(১৫)

শিষ্যের পত্র ঃ—

ক্রিয়া প্রদান করিতে পত্রে আমার প্রতি আদেশ থাকে। আমি আপনার কার্য্য আপনাকে ও আপনার আদেশ মত পরমগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া প্রার্থীকে প্রদান করি। আমার কি সাধ্য যে ঐ কার্য্য আমি একজনকে প্রদান করি। যে বিভূতি ঘটাইয়াছেন তাহাতে জানি আপনি সেই সময়ে আসিয়া উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে ক্রিয়া প্রদান করি তৎপূর্ব্বে আমার শরীর অন্যভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহা এখনও যেন মনে অঙ্কিত আছে। যাঁহার কার্য্য তিনি ভিন্ন আর কে ক্রিয়া দিতে পারে। আপনার বিচিত্র গতি। আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। অনুমানের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করি মাত্র। ঐ সব আপনাকে জ্ঞাত করিলাম। X X X দর্শন অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তদবধি প্রত্যহই বেশ দর্শন হইতেছে, তাঁহার সুকৃতি এবং আপনার দয়া। মূল কথা আপনি যেরূপ করাইবেন তদ্রূপ হইবে, সামান্য মনুষ্যের সাধ্য কি যে কিছু ঐ সব করিতে পারে।।১৫।।

গুরু — উত্তর ঃ—

উপদেশের টাকা পাইলাম, ক্রিয়া ভাল হইবে।

পত্রাবলী

(১৬)

শিষ্যের পত্রে ঃ —

আপনাকে যিনি চিনিয়াছেন তাঁহার চিন্তা কি আমি কেবল বিষয় মদে মত্ত হইয়া নিত্যধনে বঞ্চিত হইলাম ।। ১৬ ।।

(১৭)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

আপনি যে কার্য্যে জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইতেছেন তাহাতে আপনার সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইবে। ক্রিয়ার ভাবে স্থিরে লক্ষ্য রাখিয়া চলুন সব মঙ্গল হইবে ।। ১৭ ।।

(১৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি উপদেশ দিতে পারেন, যদি ভাল লোক হয়, প্রবঞ্চক না হয়, আর সব ভাল ।।১৮।।

(১৯)

শিষ্যের পত্রে ঃ—

আপনার মত করিয়া লউন তবে আপনাকে চিনিব। তাহার আশাও কিন্তু এ দাস করে।

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ— আপনার ক্রিয়া খুব ভাল হইতেছে, সব বিষয়ে ভাল হইতেছে ।। ১৯ ।।

(২০)

শিষ্যের পত্রেঃ—

আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে যোনিমুদ্রা আর করিবার দরকার নাই, ২৮টী দ্বিতীয় ক্রিয়া ও পূর্ণসংখ্যা তৃতীয় ক্রিয়া করিতে। কিন্তু চক্রের জপ ৪৩২ ওঁকারের এবং কূটস্থের মধ্যে ছয়ভাগ করিয়া অর্থাৎ X X X X X X তাহাতে ৪৩২ জপ করিব কিনা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

শ্রীগুরুর উত্তরেঃ— যাহা সহজে ও বিনা কষ্টে হয় ও চঞ্চলতা শূন্যভাবে হয় সেই ভাবেই করিবেন। স্থিরভাব আসিলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া প্রাণায়াম বা অপর কোন ক্রিয়া করিবেন না ।। ২০ ।।

(২১)

শিষ্যের পত্রেঃ—

প্রাণকে আজ্ঞাচক্রে উঠাইয়া অভ্যাস দ্বারা ঐরূপ ৪৩২ জপ করিতে হইবে অথচ প্রাণদ্বারা আজ্ঞাচক্রে ছয়টী চক্রকে ছয়টী প্রকটিত চন্দ্রে ধারণা করিয়া তাহাতেই মালার ন্যায় উঠিবে ও নামিবে, এই নয় কি? কিন্তু বাবা খানিকক্ষণ পরে মনে হয় যেন প্রাণ আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে কণ্ঠের নিম্নে নামিতেছে। সন্ধ্যার সময়ে নেশায় ভরপুর হইতে হয় তাহাতে মনের একরূপ আনন্দ হয় যাহা ব্যক্ত করা যায় না। রাত্রে এক এক দিন ১১।১২ টার সময় আর যেন প্রাণায়াম করিতে পারি না। স্থির বায়ুর ক্রিয়ার মধ্যে X X এক প্রকার শব্দ টের পাই। মস্তকের পশ্চাৎ

ভাগে অনবরত শব্দ হইয়া থাকে এবং মনের স্থিতি অনেক সময়ে মাথার হাঁড়ির খাঁজে ঘাড়ের দিকে মেডুলাঅবলঙ্গাটায় অনুভব হয়। কখন নেশার ঘোরে বিছানায় ঢুলিয়া পড়ি ।

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ— স্থির ভাব আসিলে কোন ক্রিয়া করিবেন না। আর সব ঠিক আছে ।। ২১ ।।

(২২)

শ্রীগুরুর নির্দ্দেশ ঃ—

সংক্রামক রোগ বা মড়ক হইলে ছয় শত (৬০০) প্রাণায়াম ও ৫০ টী মহামুদ্রা করা উচিত। ক্রমশঃ বাড়াইতে হয় , ১০০ শত হইতে সুরু করিয়া ২৫ টী করিয়া বাড়াইবে প্রত্যহ, মহামুদ্রা ১২ টী সুরু করিয়া প্রত্যহ দুইটী বাড়াইবে। যাহারা নিয়মিক (২০০) দুইশত প্রত্যহ প্রাণায়াম করে ও (২০) কুড়িটী মহামুদ্রা করে তাহারা একেবারে বাড়াইবে। মৎস্য মাংস খাওয়া উচিত নহে ।। ২২ ।।

(২৩)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

আমি আর কত করিব। আমার, লোকের জন্য অসুখ হইয়াছে, তাহার উপর সবকাজ আছে। ক্রিয়া করুন ও নিয়ম পালন করিয়া চলুন, ভয় নাই ।। ২৩ ।।

(২৪)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

গুরুদেবের সকলি অদ্ভুত, তাঁর বিভূতির অন্ত পাওয়া যায় না, সময় সময় এমন চতুরালি খেলিতে জানেন যে কার সাধ্য তার মধ্যে মস্তিষ্ক প্রবেশ করায় ।। ২৪ ।।

(২৫)

শিষ্যের পত্রে ঃ—

আপনার অদেশমত প্রতিদিন (১২) বারটী শ্লোক করিয়া গীতাপাঠ করিয়া থাকি ।।২৫ ।।

(২৬)

শিষ্যের পত্রে ঃ— দর্শন তত ভাল হয় নাই। জ্যোতি ও মধ্যস্থলে মাত্র তারা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ।।২৬ ।।

(২৭)

শিষ্যের পত্রে ঃ—

আজকালি আপনার কার্য্যে সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে বসিয়া উঠিতে প্রায় রাত্র দশটা হইতেছে। শেষরাত্রে যখন আপনি উঠাইয়া দেন তখন উঠি। প্রথম ক্রিয়া ২৫০ তে দুঘন্টা লাগে। দ্বিতীয় ১৩২ এক দমে এক ঘন্টা ২০।২৫ মিনিট লাগে। ভয়ানক নেশা হয়। যোনিমুদ্রা কত করিব?

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ—

আহার রাত্র ৯টার পূর্ব্বে সারিবেন। ক্রিয়া ভাল হইতেছে। যোনি মুদ্রায় ওঁ সংখ্যায় ২০০ পর্য্যন্ত জপ, ক্রমশঃ বাড়াবেন, যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাই করিবেন, কষ্ট করিয়া বাড়াইবার কোন আবশ্যক নাই। নেশা খুব ভাল। ক্রমশঃ আরও ভাল হইবে ।।২৭ ।।

২৯

পত্রাবলী

শিষ্যের পত্রে —

আমি অতি নরাধম, পাপাত্মা, মায়িক জীব আপনাকে কি করিয়া চিনিব। আপনিই আপনাকে জানেন। যাহাতে শ্রীচরণের কৃপায় আপনাকে জানিতে পারি, সকল ভোগ কাটাইয়া দিয়া চরণ আশ্রিত করুন। আপনার কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি যে আপনাতে দৃঢ়রূপে নির্ভর করিয়া যে কোন শত্রুকে দমন করা যায়, তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। আমার এই ভিক্ষা আপনার চরণে যেন আমার কলুষিত মন অহর্নিশ থাকে। আপনাকে সাদা কথায় চক্রী কহে। আমার বড় ইচ্ছা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করি। আপনার অনিচ্ছার ইচ্ছা না হইলে হইবে না। ২২৫ টী জপ প্রতিবারে করি। মহামুদ্রা প্রতিবারে ১২ টী করি। ২২৫ টী প্রাণায়ামে দেড় ঘন্টা যায়। আপনার কৃপা থাকিলে প্রথম ক্রিয়াতে সব হইয়া যাইবে।

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ—

মহামুদ্রা, প্রাণায়াম সকল সময়েই জিহ্বা উল্টাইয়া করিবেন। সব ঠিক হইয়া যাইবে। কাহার কথা শুনিবার দরকার নাই, কেবল ক্রিয়া করিয়া চলুন ।। ২৮ ।।

(২৯)

শ্রীগুরুর পত্র ঃ—

প্রথম ক্রিয়াতে সকল হইতে পারে। নিষ্ঠা চাই। পরাবস্থা ও নেশা সবই প্রথম ক্রিয়াতে আছে। ক্রিয়া করিয়া যান।

কিছুর জন্য ব্যস্ত হওয়া নিষিদ্ধ। যিনি গুরুদেবে লক্ষ্য রাখিবেন গুরু তাঁহাতে লক্ষ্য রাখিবেন, নিজে লক্ষ্য না রাখিলে গুরুর লক্ষ্য লক্ষ্য করিবে কে?।। ২৯ ।।

(৩০)

শিষ্যের পত্রেঃ—

আপনার অসীমশক্তিবলে আপনার প্রদত্ত তৃতীয় ক্রিয়া অর্থাৎ একদমে দুইশত ঠোক্কর গত কল্য শেষ হইয়াথে। আপনার কার্য্যের কি মহিমা! মনুষ্য সামান্যকাল শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে না X X X অক্লেশে দীর্ঘকাল যাবৎ শ্বাস রোধ থাকা তাহা আপনার অসীমকৃপা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্যাতীত। ক্রমে ক্রমে আপনাকে চিনাইতেছেন। X X X পরাবস্থায় পরাবস্থায় কত কি দেখান তাহা আর কি লিখিব। পরমগুরুদেবকে আপনার সহিত দেখিতে পাই। তাঁহারও কৃপা পাইতেছি।

গুরুর উত্তর— ভাল ।। ৩০ ।।

(৩১)

শিষ্যের পত্রেঃ—

২৫০ টা জপে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে। পরাবস্থা ও দর্শনাদি বেশ হয়। সন্ধ্যায় আবার (৬।।) সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় হইতে (৯) নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য করি। তৎপরেই কিছু আহার করিতে পারি না, তাহা আপনার আদেশও নহে কারণ প্রায় দশটা রাত্র পর্য্যন্ত শরীর টলমল করে। ১১টা

হইতে তিন বা সাড়ে তিন ঘটিকা রাত্র পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে পারি , ৪ বা ৪ ।। ঘন্টা নিদ্রা যাই ।

শ্রীগুরুর উত্তরঃ— নিদ্রা ৫।৬ ঘন্টা যাওয়া উচিত। যেমন সহ্য হয় সেই মত ঘৃত খাইবেন, বেশী দরকার নাই জানিবেন । আর সব ভাল হইতেছে ।। ৩১ ।।

(৩২)

শিষ্যের পত্রেঃ— স্থির বায়ুর কার্য্যগুলি করিতেছি ।।৩২ ।।

শ্রীগুরুর উত্তর— আপনার প্রতি লক্ষ্য আমার বরাবর আছে জানিবেন ও বরাবর থাকিবে ।।৩২ ।।

(৩৩)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ—

বাহ্যতঃ তাঁর জন্য প্রাণ না কাঁদিলে তাঁকে অন্তরে ডাকিবার শক্তি হয় না। অব্যয় অবিনাশী গুরুই অহেতুকী প্রেমের উদাহরণ। তিনি অতি নিকটে সর্ব্বদা সকলের কাছে আছেন ইহাতেও কেহ তাঁহার অন্বেষণে যত্নবান নহে ।।৩৩ ।।

---

(৩২) শ্রীরাম গোপাল মজুমদার, শ্রীকান্তি আচার্য্য, শ্রীরামরূপ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজয়রাম ভট্টাচার্য্য, অগ্রগণ্য আচার্য্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এবং সাধারণের নিকট অপরিচিত কয়েকজন উন্নত সাধকের পত্রাংশসকল মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত করা হইয়াছে। সকলের নাম প্রকাশিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে ।।৩২ ।।

(৩৪)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

জনৈক যুবক যক্ষ্মারোগীকে ক্রিয়া দিবার ব্যবস্থাপত্র - যোনিমুদ্রা দিবেন না। মহামুদ্রা দম বন্ধ না করিয়া করিতে বলিবেন। নাভি ক্রিয়া বেশী করিয়া করিতে বলিবেন। মহামুদ্রা যাহার বার গণিতে কষ্ট সে ছয় গণিবে ।। ৩৪ ।।

(৩৫)

শিষ্যের পত্র ঃ—

সরস্বতী পূজার দিন সাড়ে বার ঘন্টা বসিয়া ক্রিয়া শেষ করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইয়াছি। আপনি অনেক বিভূতি দেখাইয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। আপনি সকলই জ্ঞাত আছে।। ৩৫।।

(৩৬)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

যাঁহারা যাঁহারা উপদেশ লইতে চাহেন X X X আপনিই তাঁহাদের উপদেশ দিয়া দিবেন ।। ৩৬ ।।

(৩৭)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ- বেশ আনন্দের সহিত গীতা পাঠ করিয়া যান, পরে ক্রিয়া পাইবেন ।। ৩৭ ।।

(৩৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

আপনার স্ত্রীর পত্র পাইয়াছি, তাহাকে উপদেশ দিব, যতদিন তিনি না ক্রিয়া পান ততদিন গীতা পাঠ করিয়া চলুন ও পতি সেবা করিয়া চলুন, পতি সন্তোষ হইলেই ক্রিয়া পাইবেন। পতিই স্ত্রীলোকের গুরু ।। ৩৮ ।।

(৩৯)

শিষ্যের পত্রেঃ-

কেমন করিয়া এক নিশ্বাসে একদমে মস্তকসঞ্চালনের ক্রিয়া দুইশতবার হইবে জানিনা তজ্জন্য একটু অশান্তি অনুভব হয়।

গুরুর উত্তরঃ- একদমে বারটী করিবেন। প্রত্যহ একটী করিয়া বাড়াইবেন ।।৩৯ ।।

(৪০)

শিষ্যের পত্রেঃ-

আপনার যখন সকল - যখন আমরাই আপনার তখন আমাদিগের যাহা কিছু সকল আপনার শ্রীচরণে দেওয়া হইয়াছে তবে মোহেতে পরিয়া সফল দিতে দেয় না। মোহ কাটাইয়া সফল লউন, ঠাকুর আমার কিছু দরকার নাই। মাত্র আপনাকে দরকার। মন দুর্ব্বল এই ভয় ।।৪০ ।।

(৪১)

শিষ্যের পত্রেঃ-

ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি, দেশী অনেক ঔষধ করিয়াছেন, হাঁপানি কিছুতে কমে নাই। আপনার ঔষধে রোগী সুস্থ হয় ও অফিসে কার্য্য করিতেছে।

শ্রীগুরুর উত্তর - ঔষধ বেশী দিন ব্যবহার করা চাই। ক্রিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে ।।৪২ ।।

পত্রাবলী

(৪২)

শিষ্যের পত্রেঃ—

চতুর্থ প্রভৃতি ক্রিয়া শেষ হইবার পরে কুটস্থের যে কার্য্যটী দিয়াছিলেন আপনার কৃপায় সংপ্রতি কয়েকদিন হইল তাহা শেষ হইয়াছে। পূরক করিয়া কুটস্থকে X X X এইরূপ ছত্রিশ বার অর্থাৎ ৩৬ X ১২ = ৪৩২টী জপ শেষ করিয়াছি। ইহা ঠিক হইয়াছে কি না আপনি জানেন। ইহার পূর্ব্বের কার্য্যে এবং এই কার্য্যের সময়ে বেশ কুটস্থের প্রকাশ হয়। সকলই আশ্চর্য্য। রাত্রে তিন কি সাড়ে তিন ঘন্টা বসি। রাত্র এগারটা হইতে আড়াইটা মধ্যে শেষ করি। আড়াইটা হতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুমাই। চব্বিশ ঘন্টার মাত্র আড়াই ঘন্টা ঘুমাই। কুটস্থে প্রাণের স্থিতি হইলে পরাবস্থা বোধ করি ।। ৪২ ।।

গুরুর উত্তর — ভাল।

(৪৩)

শিষ্যের পত্রেঃ-

পরশু রাত্র হইতে নেশা ও একপ্রকার ঝম্ ঝম্ ও নানাপ্রকার শব্দ অনবরত হইতেছে, খুব কম সময়ে শ্বাস প্রশ্বাস বাহিরে পড়িতে অনুভব হয়। প্রথম ২৫০, দ্বিতীয় ৫০, যোনি ১৫৮, মহা ২৫, তৃতীয় ২০০, চতুর্থ ১৭। অধিকাংশ সময়ে শ্বাস উপরে থাকে। শয়নকালেও নিদ্রায় প্রাণায়াম চলে কখন কখন।

গুরুর উত্তর - ভাল ।। ৪৩ ।।

পত্রাবলী

(৪৪)

শিষ্যের পত্রেঃ— বুকের ধুক ধুক, নাড়ীর ধুক ধুক, রক্তের গতি, শ্বাসের গতি, মেরুদণ্ডের ভিতরে ভিতরে টানের গতি এক তালে থেমে থেমে চলিয়া বন্ধ হয়, মন কোথায় চলে যায়, শরীরে প্রাণ আসিলে পর বাহিরে বিন্দুর সহিত তালে তালে প্রাণ যাতায়াত করে। সব নক্ষত্র ভেদ হয়। হঠাৎ সব অনুভব হয়।

গুরুর উত্তরঃ— গুরু চালাইতেছেন। সব ঠিক হইতেছে। সব ভাল। আমি ত কূটস্থরূপে সর্ব্বদা সঙ্গে আছি।। ৪৪ ।।

(৪৫)

শিষ্যের পত্রেঃ-

লিখব কি ? আপনার অবিদিত বা কি জানি না। অহংকারে মত্ত হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু ইহা ভাবিনা এই কর্ত্তার চাবি-কাটি আপনার নিকটে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে যে অহরহ আছেন তাহা দেখিয়াও দেখি না এ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রহস্য সংপ্রতি দেখা গিয়াছে। আপনি সব জানেন। X X X চক্ষু থাকিতে কানা হইয়া রহিয়াছি, সকলই দুষ্কৃতি।

গুরুর উত্তর— গুরুই সর্ব্বত্র, গুরুই দয়াময়। আপনাতে আপনি গুরু ।। ৪৫ ।।

(৪৬)

শিষ্যের পত্রেঃ—

X X X দুইটী লোক আশ্চর্য্য আরাম হইয়াছে, বড় বড় ডাক্তারের হাতে রোগী হতাশ হইয়া আপনার কৃপায়

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এ রোগে কেহ বাঁচে না। ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছিল।

গুরুর উত্তর — যাহা হয় সব ভাল ।। ৪৬ ।।

(৪৭)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

অকালমৃত্যু বলিয়া শোক করিও না, জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নাই, এজন্য জীবের কর্ত্তব্য সমস্ত কালেই কালরূপী হংসের স্মরণাপন্ন হইয়া থাকা। এ কারণ আমি সকলকেই সাবধান ও নানাপ্রকার উপদেশ বাক্য দ্বারা কালের স্মরণাপন্ন হইয়া থাকিতে বলিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় অনেকে সেই উপদেশ পালন করেন না ।। ৪৭ ।।

(৪৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

নিজের এই শরীরে তাঁহার কতক রোগ ভোগ করিয়াছিলাম। X X X প্রদীপে তৈল না থাকিলে তাহার নির্ব্বাণলাভ হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দেহে কতক্ষণ জীবন থাকিতে পারে। আত্মার মৃত্যু নাই কারণ আত্মাই মহাকালস্বরূপ। উপস্থিত স্থিতিপদে তিনি কালেরও উপরে X X X। মহাকাল সমুদ্রস্বরূপ গতিহীন, জীবনদীর ন্যায় সেই সমুদ্রে পড়ে। কালে সতর্ক থাকিলে মৃত্যু ঘটে না। বিদেহ হইবার চেষ্টা স্বতন্ত্র ।। ৪৮ ।।

পত্রাবলী

(৪৯)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ-

যাহা ভাল তাহা হইয়া থাকে, ভাল যে কি তাহা জীব জানে না, জানিলেই ত শিব হল, ভাল কি তাহা না জানায় সময়ে ভালকে মন্দ বলিয়া মনে করি ।। ৪৯ ।।

(৫০)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ-

মনের জোব না থাকিলে যে স্থানে থাকিলে মনের বল হয় সেই স্থানে থাকা উচিত এবং সেই স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া করা উচিত ।। ৫০ ।।

(৫১)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ-

ভয়ের সহিত ক্রিয়া করিলে ক্রিয়া করা হয় না এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে রক্ষা করা যায় না ।। ৫১ ।।

(৫২)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ- উচ্চ ক্রিয়াবানের প্রাণায়ামের জোর কমিয়া যায় ।। ৫২ ।।

(৫৩)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ-

উচ্চ ক্রিয়া পাইলে অনেকে মনে করেন তাঁহার আর প্রাণায়াম বেশী করার দরকার নাই। এই কারণে উচ্চ ক্রিয়াবান মধ্যে

অধিকাংশই গোলমাল। আপনি ছয় শত প্রাণায়াম ও পঞ্চাশ যাট্‌টী মহামুদ্রা, নাভিক্রিয়া এবং চতুর্থ ও পঞ্চম করিবেন ।। ৫৩ ।।

(৫৪)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

উত্তরায়ণ অর্থে— যোগী ঘুরিয়া পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা দেবযান অবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। বিদেহ মুক্তি হইয়া পুনর্জ্জন্মরহিত হইয়া অর্থাৎ দেবলোকেও এই ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত উচ্চাবস্থা পায় ।। ৫৪ ।।

(৫৫)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

১৭২৮ প্রাণায়ামে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপক্ষয় হয় ও আত্মাতে লক্ষ্য পড়ে ।। ৫৫ ।।

(৫৬)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

যাহারা মরিলে গ্রহশান্তি করে তাহারা ভাল লোক। মরিয়াও গ্রহদের উপলক্ষে পরের মঙ্গল কার্য্য করা হয় ।। ৫৬ ।।

(৫৭)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

দেহসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করা চাই তবেই গুরুকৃপায় যাহা প্রার্থনীয় তাহা ঘটে। যাহারা বলে ভোগ সুখ ও দীর্ঘায়ু চাহি, মুক্তি চাহি না, তাদের সব ফাঁকিবাজী। তারা আশীর্ব্বাদ চায় ইহা কিন্তু হইবার নহে ।। ৫৭ ।।

পত্রাবলী

(৫৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

দায়ে পড়িলেই সকলে ঠিক হয় ও ভগবান্‌কে ডাকে। যিনি বিরোধী তিনিও দায়ে পড়িলে ভগবানের শরণ লইবেন, নিজের কাজ করিয়া চলুন ।। ৫৮ ।।

(৫৯)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

মুসলমান চারিবার নমাজ করিবেন, ব্রাহ্মণ চারিবার সন্ধ্যা করিবেন, আর সাহেব হাঁটু গাড়িয়া দুইবেলা অন্ততঃ খৃষ্টের নিকট বাইবেল পড়িবেন ও প্রার্থনা করিবেন তাহা হইলে তিনিও ভাল থাকিবেন ।। ৫৯ ।।

(৬০)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

সংসারের জ্বালা নিবারণের উপায় সংসারের সহিত বিচ্ছেদ ও তাহা অন্তরে রাখিয়া সংসারের কার্য্য করিয়া চলা। যাহা হইবার তাহা হইবে ।। ৬০ ।।

(৬১)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

ক্রিয়া করিয়া চলুন অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, সর্ব্বদা প্রাণ চিন্তা করুন। বিষয় কর্ম্মও করা চাই ক্রিয়ার পরাবস্থায় আত্মার সহিত থাকিয়া ।। ৬১ ।।

(৬২)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ- ক্রিয়ার প্রচার করিয়া চলুন ।। ৬২ ।।

(৬৩)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

জগতে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, জগৎ পরীক্ষার স্থল ,এ পরীক্ষাও নিজেকে নিজে করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল দিকেই দক্ষ হওয়া চাই, কোন বিষয়েই অভাব বোধ করা চাহি না, এক্ষণে মনের বল যাহাতে না কমে তাহা করা চাহি, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য কর্ম্মক্ষেত্রে করিতে হইবে, কোন বিষয়ে ভীত হওয়া চাহিনা, সয়তান সর্ব্বত্র মনের মধ্যে ঘেরিয়া আছে, আত্মা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে মন না যায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ক্রিয়া যেরূপ পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি সেই মত করিবেন এ বিষয়ে আর অধিক লেখা বাহুল্য ।। ৬৩ ।।

(৬৪)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

গরমের সময় ক্রিয়া যাহা পারেন সহজে তাহা করিবেন, অপর সময় মন্ত্রের সহিত শ্বাসের স্মরণ করিয়া যাইবেন, শীত পড়িলে ক্রিয়া বাড়াইয়া যাইবেন ।। ৬৪ ।।

(৬৫)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

আমি সন্ধ্যায় বসিয়া ১০৮ প্রাণায়াম, ২৮টী দ্বিতীয় প্রাণায়াম, ১৭৫ টী ঠোক্করযুক্ত তৃতীয় প্রাণায়াম, ২০০ চতুর্থ, ২০০ পঞ্চম, ১৭৫ টী ষষ্ঠ ক্রিয়া করিতেছি। ৯টী মহামুদ্রা ।।৬৫।।

(৬৬)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

মাদুলি ধারণ করার পর দেড় বৎসর মধ্যে মোটেই ফিট্ হয় নাই।

শ্রী গুরুর উত্তর ঃ- মাদুলি ধোয়া জল ব্যতীত অপর জল খাইতে নিষেধ করিবেন ।। ৬৬ ।।

(৬৭)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদ পাঠ। এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থা লক্ষ্য হইবে, তাহাই বেদান্ত দর্শন - তাহা ক্রিয়া করিয়া দেখা উচিত। পুস্তকে দেখিয়া কি হইবে? ।। ৬৭ ।।

(৬৮)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

কেহই ম্লেচ্ছ নহে, মনই ম্লেচ্ছ। নারায়ণ সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন জানিবেন। ইহা কিন্তু সকলকে বলা উচিত নহে। মনে মনে রাখিবেন ।। ৬৮ ।।

(৬৯)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

মেঘ গর্জ্জনের সময় ক্রিয়া বন্ধ রাখিবেন। দর্শন সব সময় সমান হয় না। দর্শন মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবশ্যক। যোনিমুদ্রায় সংখ্যা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়াইতে পারেন কিন্তু কষ্ট করিয়া বাড়াইবেন না, (২০০) দুই শত পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন, (২০০) দুই শতের বেশী নহে ।।৬৯।।

(৭০)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

আমি আমার বোধ যে বস্তুতে থাকে তাহাই মোহ এবং তৎ তৎ বিষয়ে নিতান্ত আসক্তি থাকিলে উহা মনে আসিয়া থাকে। সব নারায়ণের আমার কিছু নহে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিবেন ।। ৭০ ।।

(৭১)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

অনিত্য বিষয়ের জন্য এত ভাবনা কি ? যাহার যাহা কর্মফল আছে তাহার খন্ডন কে করিতে পারে ? আপনার সাধ্য কি যে আপনি সব খন্ডন করেন, তবে আপনার কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ ও অতীতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের চিন্তার সহিত বর্ত্তমানের সমস্ত কার্য্য করা। তালপাতার সিপাহীর মত হলে কি হবে ?।। ৭১ ।।

(৭২)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ— যোগী হইতে গিয়া এত দুর্ব্বল হৃদয় কেন ? গাছতলা ত কেহ লয় নাই, নদীর জল ত কেহ লইবে না ?।। ৭২ ।।

(৭৩)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ—

অর্থে সুখ কাহারও হয় নাই, হইবেও না। মনের কর্‌করানিতে অর্থের চেষ্টা। এত ভবিষ্যতের ভাবনা কেন ? সব পুতুল নাচের পুতুল, হায়রে পয়সারে এই বোল নিয়ে সবাই চিঁ চিঁ করছে। আর কোন বোল্‌ ভারতে নাই ।। ৭৩ ।।

(৭৪)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

মনের এই বল্ রাখিয়া ক্রিয়া করিতে হইবে - আমি কাহার নহি, কেহ আমার নহে, একদিন নিশ্চয় সকলকে সব ছাড়িতে হইবে। সেদিন যে কাহার কবে হবে নিশ্চয় নাই। লোকে নিশ্চিন্ত থাকে কিন্তু সে অবস্থা যখন হঠাৎ আসে তখন সব হায় হায় করে। অতএব লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলকার সেই অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত ।। ৭৪ ।।

(৭৫)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

মায়া কর্ত্তৃক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা গুরুকে অর্পণ করা চাই। অর্পণ হইলে তাহাতে আর স্বত্ব থাকে না। যখন দেহ অর্পণ করেছেন তখন নিজের দেহ দেখলেই ত আমাকেই স্থুলেতে দেখা হয়। এইরূপ ভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন ।। ৭৫ ।।

(৭৬)

যোগিরাজের উপদেশ ঃ-

X X X এইরূপ চক্রে চক্রে জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ মন চক্রপথ ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইবে না এবং ক্রিয়ার শেষ

সময়ের ক্রিয়ার পরাবস্থার পর যে অবস্থার শ্বাস টানা ফেলার ইচ্ছা স্বতঃ থাকে না তাহাতে মন রাখা চাই। উক্ত অবস্থা কৃষ্ণ পদবাচ্য। কৃষ্ণ শব্দের অর্থই তাহা।

কৃষ্ণ = কৃষ্ ধাতু কর্ষণ করা আর "ণ" নিবৃত্তি বাচক। কৃষি র্ভূ বাচক শব্দ, আর ন নিবৃত্তি বাচক। তয়ো রৈক্যং পরমব্রহ্ম কৃষ্ণঃবিপ্রঃ।

অর্থাৎ শ্বাসের টানাফেলার নিবৃত্তির অবস্থা যাহা স্বতঃ হইয়া থাকে তাহাই স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ, যাহারা গোপনে সাধন করে তাহারাই গোপী, গোপী শব্দের অর্থই ঐ। গোপীর নিজশরীররূপ বৃন্দাবনে এই জীবন কৃষ্ণের প্রকাশরূপ আগমন প্রতীক্ষা সর্ব্বদা করিয়া থাকে, প্রেম ও ভালবাসার সহিত আপনারা ক্রিয়া করেন না, গুরুকৃপা চাহিতে হয় না, তাহা গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে আপনা আপনি না চাহিতে পাইয়া থাকে, অতএব গুরুবাক্য দৃঢ় করিয়া গুরুর উপদেশ মত নিজ স্থিরপ্রাণে ভগবান্ বোধ, গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে একদিন তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা অতীব নিশ্চয় জানিবেন।। ৭৬।।

(৭৭)

শ্রী গুরুর পত্রে ঃ-

বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করা উচিত। চক্রে চক্রে মন্ত্র ভুল হইলে ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক হয় না, ইহাতে ক্রিয়া তামসভাবে পরিণত হইয়া ক্রিয়াকালে নানা রকম চিন্তার উদয় হয় ফলে মন কুচিন্তায় রমণ করিতে থাকে, মনের ভগবৎ চিন্তা হয় না।। ৭৭।।

(৭৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

প্রাণায়াম করিবার সময় সকলকেই চক্রে চক্রে মন্ত্র জপ করিতে বলা হয়। দুঃখের বিষয় তাহা না করিয়া কেবল শ্বাস টানা ফেলা মাত্র হয়। আর বসিয়া বসিয়া নানা চিন্তা করা হয়। কাহাকেও ক্রিয়াকালে ভগবৎচিন্তা ব্যতীত অপর চিন্তা করিতে উপদেশ দেওয়া হয় না।। ৭৮ ।।

(৭৯)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

অনেকের চক্রে চক্রে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চক্রে মন্ত্র জপ হয় না। ইহা না হইলে তামসিক ক্রিয়া হইল, ইহার ফলও তামসিক। অতএব প্রাণায়াম কালে সকল চক্রে লক্ষ্য রাখিয়া মেরুদণ্ডে ছটি চক্রে জপ হওয়া চাই।। ৭৯ ।।

(৮০)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

অন্তর্ম্মুখী গতি করিয়া শ্বাস টানা ও ফেলার সময় প্রত্যেক চক্রে জপ হওয়া চাই, উক্তরূপ মন্ত্র জপ না হইলে উহা তামসিক ক্রিয়াতে পরিণত হইল। উক্তরূপ ১২টী প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার, এইরূপ ১৪৪ প্রাণায়ামে একটী ধারণা ।। ৮০ ।।

(৮১)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

অনেতেক দুই ঘন্টা প্রাণায়ামে বিধিপূর্ব্বক দুইটী প্রাণায়াম

হয় না। মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্ তৎ তামসং উদাহৃতং। দক্ষিণা = ক্রিয়ার পর স্থির অবস্থায় লক্ষ্য রাখিয়া স্থির অবস্থায় স্থিতি। অনেকের তাহাতে লক্ষ্যই থাকে না। মধ্যে মধ্যে উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে সব গোলমাল হইয়া যায়। ৫ ঘন্টা প্রাণায়াম না করিয়া যাহাতে বিধিপূর্ব্বক ২টাও করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। সকলের এইরূপ বিধিপূর্ব্বক করা উচিত ।। ৮১ ।।

(৮২)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ- ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক করিলে সব মঙ্গল হইবে ও শান্তি পাইবেন ।। ৮২ ।।

(৮৩)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ-

ঔষধের প্রচার করিবেন, প্রথম ঔষধ ক্রিয়া - ক্রিয়ার প্রচারে মন নির্ম্মল হয় ও ভগবৎকৃপাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে আনন্দ লাভ করিবেন। যাহাতে দুই বেলায় ছয়শত প্রাণায়াম বিধিপূর্ব্বক হয় তাহা করিবেন ।। ৮৩ ।।

(৮৪)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ- ক্রিয়া দানই সাত্বিক দান ।। ৮৪ ।।

(৮৫)

শিষ্যের পত্রেঃ-

কাহাকে কখন কি ভাবে রাখেন তাহা আপনিই জানেন। আপনার ভাবাপন্ন না হইলে আপনার ভাব উপলব্ধি করে

কাহার সাধ্য। কখনো কাহাকে তাহার কর্ম্মফলের জন্য ঊর্দ্ধে উঠান আবার কখনো কাহাকে রসাতলে রাখেন। তাহা বোধ হয় শিষ্যের কর্ম্মফলের ভোগ জন্যই করেন, তাহাতে শিষ্যের অপরাধ কি? আপনি অন্তর্যামী ভগবান্ সকলই জানিতেছেন।।৮৫।।

(৮৬)

শিষ্যের পত্রেঃ-

কতকগুলা পাষন্ড তরাইতে কি আপনার আবির্ভাব হয় নাই? আপনি অন্তর্যামী। আপনার প্রতি আমার এখনও কিভাব রহিয়াছে তাহা আপনি জানেন। দোহাই বাবা, উপরে উঠাইয়া ফেলিয়া দিবেন না। যে ভাবে ফেলিয়াছেন বড় লাগিয়াছে। খুব ক্রিয়া করাইয়া লউন। কাম্‌কে জয় করান। কি উপায়ে কি করিব উপদেশ দিউন। মৎস্য মাংস খাই নাই।।৮৬।।

(৮৭)

শিষ্যের পত্রেঃ—

স্নানান্তে ১ ঘন্টা, রাত্র ১১ টা পরে ১ ঘন্টা, এই দুই ঘন্টা ক্রিয়া করি। গীতা ও আপনার প্রদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করি। ছোটদের শিব পূজা ও গীতা পাঠ বিধি, পরে তাহারা ক্রিয়া পাইবে জানিলাম।

শ্রীগুরুর উত্তরঃ— নিয়ম মত আসন করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যার পর বসিবেন। পঞ্চগব্য ও পঞ্চমৃত ব্যবহার করা উচিত ।।৮৭।।

(৮৮)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করা চাই, অবিধিপূর্ব্বক করা চাই না। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্। অতএব যাহাতে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ (ক্রিয়া) করা হয় তাহা বিশেষরূপ করিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক বিধিপূর্ব্বক উপদেশমত কার্য্য করিবেন নচেৎ বিড়ম্বনা মাত্র ।। ৮৮ ।।

(৮৯)

গুরুর পত্রে ঃ-

ক্রিয়া করিয়া চলুন, সর্ব্বদা শ্বাসে মন রাখিতে চেষ্টা করুন, মন্ত্রের সহিত। মহামুদ্রা দুবেলা ২৪ টা করিবেন তাহাতে বায়ু সাম্য হইবে ।। ৮৯ ।।

(৯০)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

আমি এত সংসার মায়াতে মোহিত যে যিনি এই মায়িক জীবের কর্ণধার এবং ঐশ্বর্য্যের আধার সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আপনার কৃপায় এই তুচ্ছ জীবন ধারণ করিয়া সুখ সম্পদে মত্ত। আপনি দয়া করিয়া যে অবস্থা উপলব্ধি করাইয়াছিলেন তাহাতে এ নরাধম আপনার অনেক জিনিষ এই পাপ দেহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল ।। ৯০ ।।

(৯১)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

১৪৪ প্রথম, ১৪৪ দ্বিতীয়, ১৪৪ তৃতীয়, ২৮৮ ধ্যানের কাজ, ভিতরে থাকিয়া ৩৩৬ মন্ত্রযুক্ত পঞ্চম, এবং স্থিতিতে ১২ X ১৪ ষষ্ঠ, মন্ত্রযুক্ত, পরে সপ্তম হইতে দোকড়ি দাদার আদেশ মত সব করি ।।৯১।।

(৯২)

শিষ্যের পত্রে ঃ-

আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান। পূজ্যপাদ দোকড়ি দাদা ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে আপনা হতে অভিন্ন তৎজ্ঞান এ দাসকে দিয়াছেন এবং আপনার কৃপায় আপনাকে চিনিতে পারি। একাদশ ক্রিয়াতে স্থিতি ও গতি দোকড়ি দাদা (দেখাইয়া) দিয়াছেন। ক্রিয়ার-পরাবস্থার- পর আপনাদের তিন জনকে দেখি - আর কত মহর্ষি- আপনিই এখন কূটস্থে চালক সকলই বুঝাইতেছেন, পত্রে কি লিখিব-সর্ব্বদাই ত চালাইতেছেন, প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও পাইয়া তবু কেন পত্রের উত্তরে সব বিশ্বাস চাই? ।।৯২।।

(৯৩)

শ্রীগুরুর পত্রেঃ- গর্ভাবস্থায় মানসিক ক্রিয়া। শ্বাসের কাজ করিবে না ।।৯৩।।

পত্রাবলী।

(৯৪)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

মুখের লালা গিলিয়া ফেলিবেন, নাকের ছিদ্রের উপর আর একটা আটা তাহার উপর যাইবে, ক্রমশঃ হইবে, জোর করিবেন না, করিলে অনিষ্ট হইবে। উচ্চ ক্রিয়ার পরে উহার কাজ হইবে ।। ৯৪ ।।

(৯৫)

শ্রীগুরুর পত্রে -

দেখা করার জন্য এত ব্যস্ত কেন? হাড় মাস (আমার) দেখিয়া লাভ কি? কূটস্থে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়মাস বা "আমি" এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস ।। ৯৫ ।।

(৯৬)

শ্রীগুরুর পত্রে ঃ-

প্রাণায়াম কালে প্রত্যেক চক্রে চক্রে মন্ত্র ভুল না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। ক্রিয়া কালে মনে অপর বিষয় চিন্তা না করে, চক্রে চক্রে মন্ত্র ভুল না হইলে মনে শান্তি স্থায়ী হইবে ।। ৯৬ ।।

(৯৭)

শিষ্যের পত্রে ঃ ষষ্ঠ ক্রিয়া শেষ করিয়াছি। আপনি অন্তর্যামী ভগবান্, আপনি জানেন। হবিষ্যান্ন দিনে ও রাত্রে ফলমূল মাত্র খাই। গুরুর উত্তর ঃ— সব ভাল ।। ৯৭ ।।

(৯৮)

শিষ্যের পত্রেঃ—

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের ক্রিয়ার বিধি নিষেধ জানাইয়া শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ দিবেন।

গুরুর উত্তরঃ— উপস্থিত ক্রিয়া বন্ধ রাখা উচিত। সন্তান হইবার পর তিন মাস কাল পরে যখন শরীর সবল সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হইবে তখন ক্রিয়া করিবেন কেবল নাভিক্রিয়া এবং কষ্ট হইলে তাহাও না। কেবল ভ্রূর মধ্যদেশে লক্ষ্য রাখিয়া কূটস্থের রূপ যাহা তেজময় তাহাই চিন্তা করিবেন। যোনিমুদ্রা না করিয়া ইহা করিবেন।- কেবল লক্ষ্য ও চিন্তা মাত্র।। ৯৮।।

(৯৯)

প্রতিনিধি শিষ্যের পত্রেঃ-

পূর্ব্বরাত্রে এ অধমাধমের প্রতি কৃপা করিয়া আমায় নিদ্রিতাবস্থায় আসিয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন, যদিচ সকল কথা ঠিক ধারণা করিতে পারি নাই, তবে অনেক ধারণা করিয়াছিলাম (ক)। X X X বেশ দর্শন করাইয়া দিয়া ছিলেন। এখন যাহা করিবার আপনি করিবেন। প্রাণায়াম মন্দ হয় নাই। তাঁহার অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্রিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের পাঁচ টাকা মনিঅর্ডার করিয়াছি। পাইয়া থাকিবেন (খ)।

শ্রীগুরুর উত্তর- (ক) ভাল। (খ) পাইয়াছি।

পত্রাবলী।

(১০০)

শিষ্যের পত্রেঃ-

২৫০টী প্রথম ক্রিয়ার প্রাণায়াম করিয়া যোনিমুদ্রা ১০৫টী জপ তৎপরে ৫০ টী দ্বিতীয় ক্রিয়ার প্রাণায়ম পরে ১২টী মহামুদ্রা পরে তৃতীয় ক্রিয়া করিয়া থাকি - কল্য ১৫৪ টী ঠোক্কর হইয়া গিয়াছে। কল্য প্রথম ক্রিয়াতে খুব পরাবস্থা হয়। যোনিমুদ্রায় কষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া এই কষ্ট।

শ্রীগুরুর উত্তরেঃ—

যাহা সহজে পারেন তাহা করিবেন। তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। তাড়াতাড়ি করিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না ।। ১০০ ।।

(১০১)

লেখক - শ্রী নীলমাধব সরকারঃ—

(নীলমাধবের পত্রাবলীর মূল পান্ডুলিপিতে চতুর্থ সংর্খকপত্র।)

উত্তরদাতা - শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

নমঃ শ্রীগুরুবে নমঃ

গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।

তব শ্রীচরণ ধ্যানাকাঙ্খী শ্রীনীলমাধব সরকার।

ঐ শিষ্যের পত্রে ঃ-

আপনার কৃত যে নূতন সাংখ্য দর্শন ছাপা হইয়াছে আমার নামে তাহা একখানা পাঠাইয়া দিন। ।। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলাম। শ্রীগুরুর উত্তর- মনু ও সাংখ্য পাঠান গেল। মনুর মূল্য ।।০, সাংখ্যের মূল্য নাই।

ঐ শিষ্যের পত্রে ঃ- কেবল ক্রিয়া করিবার ইচ্ছায় ও রোগ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছায় দুই মাসের ছুটী লইয়াছি।

১৭০০ (১৭২৮?) ক্রিয়া কি রকম ব্যবস্থায় করিব? খাইয়া? না খালি জল খাইয়া? এখানে কেহ ঐ রকম বসে নাই।

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ- একাসনে বসিয়া ক্রিয়া করিবেন। পিপাসা পাইলে আসনে বসিয়া ঘৃত ও জল খাইবেন। আসনে বসিয়া পা বদলাইতে পারিবেন।

ঐ শিষ্যের পত্রে ঃ-

শরীর বিশেষ ভাল না থাকিলে অনেক ক্রিয়া করিলেও যোনি মুদ্রায় ২০০ সংখ্যা হয় না। আর কোন দিন সামান্য ক্রিয়াতেই দুইশত হয়। প্রত্যহ কি রকম করিয়া কতদিনে এই শরীর রোগবিহীন হইয়া নিজের আয়ত্ত করিতে পারিব?

শ্রীগুরুর উত্তর ঃ- অধিক করিয়া মহা মুদ্রা করিবেন। ৩০০ নেবুর (ঔষধ) পাঠাইবার নিমিত্ত চারি আনার টিকিট পাঠাইবেন।

****

যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার অন্যতম প্রধান শিষ্য যোগাচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিত এক পত্রের নকল শ্রীবোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য্য প্রনীত এবং "বাহান্ন বিঘা" দেওঘর থেকে প্রকাশিত "ঈশ্বরতত্ত্বালোচনা" গ্রন্থ্ থেকে সংযোজিত করা হল।

ঈশ্বর কাশীর বাবার নিকট লিখিত একটি বহু পুরাতন নষ্টপ্রায় পত্র গুরু বাবার বাক্সে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কাশীর বাবার উত্তর কিনারায় লিখিত আছে। চিঠিতে তারিখ আছে কিন্তু সাল লিখা নাই। কাশীর বাবার উত্তর সমেত চিঠির নকল দিতেছি :-

শ্রীচরণকমলেষু

কাশীর বাবার উত্তর

আজ ৬ দিন হইল আমার আত্মীয় কেদার নাথ রায়ের স্ত্রী দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেদার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই ক্রিয়ান্বিত। তাঁহার পত্নী অন্তসত্বাঃ অবস্থায় আপনার আজ্ঞামত ক্রিয়া প্রাপ্ত হন কিন্তু গর্ভা-বস্থা প্রযুক্ত পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিতে পারেন নাই তথাপি যাহা করিতেন তাহাতেই তিনি তৃপ্তি পাইতেন ও খুব আনন্দে ছিলেন। প্রায়ই কুটস্থ্ দেখিতেন ও গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাংশে ভাল ছিল।

ব্রহ্মে স্থিতি হওয়ার সৌভাগ্যবতী পূর্ব্বে নিজের মৃত্যুর বিষয় অনুভব করিয়া ছিলেন

তাঁহার মৃত্যুও অতি ভাল রূপে হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে দেহত্যাগের একমাস পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার স্বামীকে সর্ব্বদাই বলিতেন আমার কাল নিকট হইয়াছে, আমি এখানে আর বেশীদিন

থাকিব না। ওমুকের নিকট আমার ৫ টাকা দেনা আছে তুমি পরিশোধ করিবে , মৃত্যুর সময় তোমার সহিত আমার দেখা হইবে না আমার গর্ভে যে সন্তান আছে তাহাও তোমাকে দিয়া যাইব না। তাঁহার স্বামী বলিতেন এ সব তোমার পাগলামী, তুমি গুরুদেবকে স্মরণ কর । তাঁহার উত্তরে তিনি বলিতেন তাহা আমি জানি, গুরুদেব ছাড়া আর আমার কেহ নাই -তুমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে এ সব আমার পাগলামি কি না ।

যে রাত্রে পীড়া হইবে সেই রাত্রের সন্ধ্যার পর বাড়ীর সকলে দেখিয়াছিল কে একটি লোক বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল, কিন্তু পরে অদৃশ্য হইয়া গেল । এই লোকটি কে ?

উত্তমপুরুষ

হঠাৎ ভোর রাত্রে গর্ভ হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তশ্রাব হয়, রক্ত কিছুতেই থামে নাই । ঐ উপলক্ষে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে নাই এবং প্রসব হইতে পারেন নাই । তিনি সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া কুটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া অনুমান করি প্রাণায়াম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন ।

যথার্থ

মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী তাঁহার মুখে হাত দিয়া দেখেন যে জিহ্বা বোধ হয় কুটরে উঠিয়াছে ইহা কি সত্য?

হ্যাঁ

আমার স্ত্রী অত্যন্ত শোকাগ্রস্থ হইয়াছিল তাহার একদিন পরে ক্রিয়াকালে যোনিমুদ্রায় দেখে যে কূটস্থের মধ্য আপনি স্বশরীরে উপবিষ্ট - সম্মুখে একখানি পুঁথি

অব্যক্ত

রহিয়াছে, পাশে মৃত স্ত্রীলোকটি বর্ত্তমানা, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছুমাত্র বৈলক্ষন্য হয় নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মুখে যে ব্রণটি ছিল তাহাও বেশ দেখা গেল ও আপনার সহিত হাত নাড়িয়া কি কথা কহিতেছেন ও আপনি হাসিতে হাসিতে তাহার জবাব দিতেছেন। এ সব কি ব্যাপার প্রভু দয়া করিয়া লিখিবেন।

ব্রহ্মেতে লীন হই লেন। শ্রাদ্ধের দিন যথা-সাধ্য ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবেন ব্রাহ্মেতে থাকিলেই অনুভব পদবোধ হয়।

তাঁহার কি রূপ গতি হইল শুনিতে বাসনা করি। মৃত্যু পরই কি তিনি সুক্ষ্মদেহে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ? তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যুর ঘটনা কিরূপে জানিতে পারিয়া ছিলেন ?

তিনি কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ? যদি করিয়া

না

করিয়া থাকেন কোথায় ?

এই দর্শনের পর রাত্রে আমার স্ত্রী পুনরায়

পুরুষোত্তম

কূটস্থে আরও দিব্য পুরুষ দেখিয়া ছিলেন। তাঁহার খুব বাবুলোকের মত চেহারা তিনি কে ? প্রভু দয়া করিয়া লিখিবেন।

শ্রীচরণে শতকোটি নিবেদন মেতং

শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মন

শ্রীউমাচরণ রায়

তারিখ ৩১ ভাদ্র